ব্যবহার ভানু

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নির্মিতঃ
পঠন-পাঠন ব্যবস্থায়াম্
তৃতীয়ং পুস্তকম্
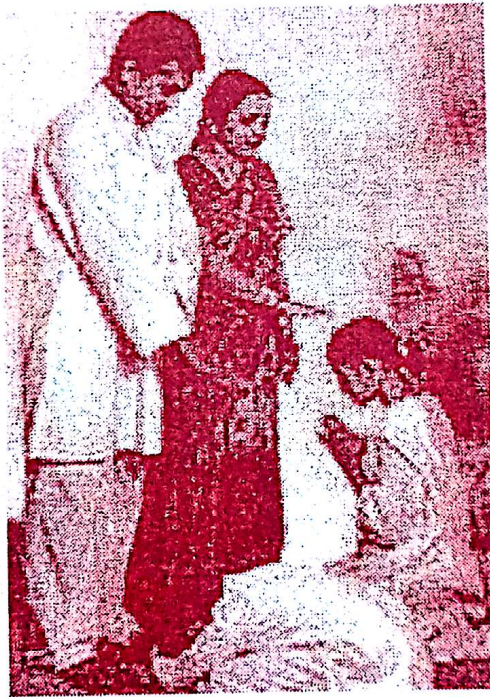
প্রকাশক ঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ২২৪১-৪৫৮৩

ভূমিকা

আমি এই সংসারে পরীক্ষা করে নিশ্চয় করেছি, যে ধর্মযুক্ত ব্যবহার সহ ঠিক ঠিক আচরণ করে তার সর্বত্র সুখলাভ হয় এবং যা বিপরীত আচরণ তা সর্বদা দুঃখদায়ী হয়ে নিজের ক্ষতি করে। দেখুন যখন কোনো সভ্য মনুষ্য বিদ্বানদের সভায় অথবা কারো কাছে গিয়ে নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী নমস্তে ইত্যাদি নম্রতাপূর্বক প্রদর্শন করে, বসে অন্যের কথা ধ্যানপূর্বক শুনে, তার মতামত জেনে নিরভিমানী হয়ে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করে তখন সজ্জন লোকেরা প্রসন্ন হয়ে তার সৎকার এবং যে আবোল-তাবোল বলে তার তিরস্কার করে।

যখন মনুষ্য ধার্মিক হয় তখন তার বিশ্বাস ও মান্য শত্রুরাও করে এবং যখন অধর্মী হয় তখন তার বিশ্বাস ও মান্য মিত্ররাও করে না। এর দ্বারা প্রমাণিত যে অল্প বিদ্যা বা লোভী মনুষ্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেয়ে সুশীল হয়, তার কোনো কাজ নষ্ট হয়না, এই জন্য আমি মনুষ্যকে উত্তম শিক্ষার অর্থ সর্ব বেদাদিশাস্ত্র ও সত্যাচারী বিদ্বানকে রীতিযুক্ত এই ব্যবহারভানুঃ গ্রন্থ রচনা করে বলছি যে, যাকে দেখে-দেখিয়ে, পড়িয়ে মনুষ্য নিজ-নিজ সন্তান এবং বিদ্যার্থীদের আচার অত্যুত্তম করুক, যার ফলে আপনি এবং তারা সকলে সব দিন সুখী থাকুক।

গ্রন্থে কোথাও কোথাও প্রমাণের জন্য সংস্কৃত ও সুগম ভাষা প্রয়োগ করেছি এবং কোথাও অনেক উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে সংশোধনের অভিপ্রায় স্পষ্ট করেছি যে, যাতে সকলে সুখপূর্বক বুঝে নিজ-নিজ স্বভাব সংশোধন করে সকলে উত্তম ব্যবহার প্রতিপন্ন করুক।

কাশী, ফাল্গুন শুক্লা ১৫, সং ১৯৩৬ — দয়ানন্দ সরস্বতী

व्यवहारभानु की पाण्डुलिपि
का प्रथम पृष्ठ

মহর্ষি দয়ানন্দের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি

[illegible]

दयानन्दसरस्वती

অথ বেদাঙ্গ প্রকাশঃ

তত্রত্যঃ তৃতীয়ো ভাগঃ

ব্যবহার ভানুঃ

শ্রীমৎ স্বামিদয়ানন্দ সরস্বতী নির্মিতঃ

পঠন পাঠন ব্যবস্থায়াং তৃতীয়ং পুস্তকম্

পঠন পাঠন ব্যবস্থায় এটা তৃতীয় পুস্তক।

এমন কোন মনুষ্যের আত্মা হবে যে, সুখ প্রতিপন্নকারী ব্যবহার ত্যাগ করে বিপরীত আচরণ করায় প্রসন্ন হয়। যথাযোগ্য ব্যবহার করা ব্যতিরেকে কারো সর্ব সুখ হতে পারে ? মনুষ্য কি সুশিক্ষা দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফলকে প্রতিপন্ন করতে পারে না এবং এ ছাড়া পশুসমান দুঃখভোগ করে ? যেহেতু সব মনুষ্যকে সুশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক এইজন্য বালক থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত মনুষ্যের সংশোধনের জন্য ব্যবহার সম্বন্ধীয় শিক্ষার বিধান করা হচ্ছে।

প্রশ্ন - **কেমন পুরুষ অধ্যাপনা ও শিক্ষা করাবে ?**

উত্তর - অধ্যাপনাকারীর লক্ষন –

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।
যমর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পন্ডিত উচ্যতে।।১।।

যার পরমাত্মা ও জীবাত্মার যথার্থ জ্ঞান, যে আলস্য ত্যাগ করে সর্বদা উদ্যোগশীল, সুখদুঃখাদি সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন, ধর্মের নিত্য সেবনকারী হয়, যাকে কোনো পদার্থ ধর্ম থেকে ছাড়িয়ে অধর্মের দিকে আকর্ষিত করতে না পারে তাকে পন্ডিত বলে।।১।।

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধবান্ এতৎ পন্ডিত লক্ষণম্।।২।।

যিনি সদা প্রশস্ত ধর্মযুক্ত কর্ম করেন এবং নিন্দিত অধর্মযুক্ত কর্মকে কখনও সেবন করেন না। কদাপি ঈশ্বর, বেদ ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন

না এবং পরমাত্মা, সত্যবিদ্যা ও ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী সেই মনুষ্য পন্ডিতের লক্ষনযুক্ত হয়।

ক্ষিপ্রং বিজানতি চিরং শৃনোতি বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে সকামাৎ।
নাসংপৃষ্টো চ্যুপয়ুক্তে পরার্থে তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পন্ডিতস্য।।৩।।

যিনি বেদাদি, শাস্ত্র এবং অন্যের বলার অভিপ্রায় কে শীঘ্র বুঝতে পারেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদাদি শাস্ত্র ও ধার্মিক বিদ্বানের বচনকে ধ্যান দিয়ে শুনে ঠিকমতো বুঝে, নিরভিমানী শান্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করেন, পরমেশ্বর থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থ জ্ঞাত হয়ে তদ্বারা উপকার নিতে তনু, মন, ধনে প্রবৃত্ত হয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোকাদি দুষ্টগুণ থেকে পৃথক থাকেন, কারো জিজ্ঞাসা করায় বা উভয়ের বার্তালাপে বিনা প্রসঙ্গের অনুপযুক্ত ভাষণাদি ব্যবহার না করা ব্যক্তি, এই পন্ডিতের প্রথম বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।।।৩।।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পন্ডিতবুদ্ধয়ঃ।।৪।।

যে মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য পদার্থের কখনও ইচ্ছা করেন না, অদৃষ্ট বা কোনো পদার্থের নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেলে শোক করার অভিলাষ করেন না এবং বিশাল দুঃখযুক্ত ব্যবহারের প্রাপ্তিতেও মূঢ় হয়ে হতাশ হয়না, সেই সব মনুষ্যকেপন্ডিতের বুদ্ধি যুক্ত বলা হয়।

প্রবৃত্ত বাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পন্ডিত উচ্চতে।।৫।।

যার বানী সব বিদ্যায় পারঙ্গত, অত্যন্ত অদ্ভুত বিদ্যাসকলের ব্যাখ্যাকারী, না জেনে কোনো পদার্থ কে তর্কমাধ্যমে শীঘ্র জ্ঞাতা, শ্রুত, বিচার্য বিদ্যাসকলকে সর্বদা উপস্থিত রাখার এবং সব বিদ্যার গ্রন্থকে অন্য মনুষ্যকে প্রদাতা শীঘ্র অধ্যাপনাকারী বক্তা মনুষ্য, তাকেই পন্ডিত বলা হয়।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং, যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসং ভিন্নার্যমর্যাদঃ পন্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ।।৬।

যারশ্রুত ও পঠিত বিদ্যা স্বীয় বুদ্ধির সর্বদা অনুকূল এবং বুদ্ধি ও ক্রিয়া

শ্রুত, পঠিত বিদ্যানুয়ায়ী যিনি ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মর্যাদার রক্ষক এবং দুষ্ট ডাকাতদের রীতিকে বির্দীনকারী মনুষ্য, সেই পন্ডিত নামের যোগ্য ।।৬।।

যেখানে এমন সত্যপুরুষ অধ্যাপনাকারী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধ্যয়নকারী হন সেখানে বিদ্যাও ধর্মের বৃদ্ধি হয়ে সর্বদা আনন্দই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেখানে নিম্নলিখিত মূঢ় অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপনাকারী হয় সেখানে অবিদ্যা ও অধর্মের উন্নতি হয়ে দুঃখই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(প্রঃ) কেমন মনুষ্য পড়াবে না এবং উপদেশ করাবেন ? মূর্খের লক্ষণ।

(উঃ) অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।

অর্থাংশ্চা কর্মনা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।.১।।

যে কোন বিদ্যা পাঠ না করে এবং কোনো বিদ্বানের উপদেশ না শুনে বড়ো অহংকারী, দরিদ্র হয়েও ধনসম্পর্কীয় বড় বড় কাজের ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং না করে বড় বড় ফলের আশা করেন যিনি।।১।।

দৃষ্টান্ত

যেমন – জনৈক দরিদ্র শেখচিল্লী নামক ব্যক্তি কোনো গ্রামে বাস করতো। সেখানে কোনো শহরের ব্যবসায়ী দশ টাকা ধার নিয়ে ঘি কিনতে এসেছিল। সে ঘী নিয়ে কলশে ভরে কোনো মজুরকে খোঁজ করছিল এমন সময় শেখচিল্লী সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এই কলশকে তিন ক্রোশ দূরত্বে নিয়ে যাবার কী মজুরী নেবে ? সে বললো – আট আনা। পরবর্তীতে ব্যবসায়ী বললো - চার আনা নিতে হয় নাও। সে বললো – ঠিক আছে। সেখচিল্লী কলশ নিয়ে চললো এবং ব্যবসায়ীও তার পিছে পিছে চললো। ব্যবসায়ী মনে মনে ভাবতে থাকে যে, দশ টাকার ঘী বেচে এগারো টাকা আসবে। দশ টাকা শেঠকে দেবে এবং এক টাকা ঘরের পূঁজি থাকবে। এইভাবে দশ বারে, দশ টাকা হয়ে যাবে, এই প্রকার দশ থেকে শ, শ থেকে হাজার, হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি। পুনরায় সব জায়গায় কুঠি করে নেবো এবং সব রাজারা আমার কাছ থেকে কর্জ নেবে। ইত্যাদি বড়ো বড়ো আশা করতে থাকে। এদিকে শেখচিল্লী চিন্তা করলো যে, চার আনার তুলো নিয়ে সূতো

কেটে বেচবো তাহলে আট আনা পাওয়া যাবে। আঠ আনা থেকে এক টাকা হয়ে যাবে। পুনরায় ঐ ভাবে এক থেকে দুই টাকা হবে। তা দিয়ে একটা ছাগল নেবো। যখন তাদের বাচ্চা হবে, তা বিক্রী করে একটি গাভী কিনব। তার বাচ্চা বিক্রী করে একটি মোষ নেবো। তার বাচ্চা বিক্রী করে একটি সাদা ঘোড়া কিনব। যার বাচ্চা বিক্রী করে একটা সাদা হাতি কিনব এবং তার বাচ্চা বিক্রী করে দুটি বিয়ে করব। একটা বৌর নাম প্রিয়া এবং অন্যটির নাম অপ্রিয়া রাখব। যখন প্রিয়ার ছেলে কোলে বসতে চাইবে, তখন বলব – এসো বাছা বসো। এবং যখন অপ্রিয়ার ছেলে এসে বলবে – আমিও বসবো। তখন বলব – না-না, এই বলে মাথা নাড়া দিল। কলশ পড়ে ভেঙে গেল এবং ঘী মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসায়ী কাঁদতে লাগল এবং শেখচিল্লীও কাঁদতে থাকে। ব্যবসায়ী শেখচিল্লীকে ধমক দিল – ঘী ফেলে দিলি আবার কাঁদছিস ? তোর কী ক্ষতি হয়েছে ? শেখচিল্লী – তোর কী নষ্ট হয়েছে ? তুই কাঁদছিস কেন ? ব্যবসায়ী – আমি দশ টাকা ধার নিয়ে প্রথম বার ঘি কিনেছিলাম, তার উপর বড় লাভের কথা চিন্তা করেছিলাম। আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। আমি কাঁদব না কেন ? শেখচিল্লী – তোর তো দশ টাকারই ক্ষতি হয়েছে মাত্র, আমার তো বানানো ঘর নষ্ট হয়ে গেল ? আমি কেন কাঁদব না ? ব্যবসায়ী – তোর কান্নায় কি আমার ঘী এসে যাবে ? শেখচিল্লী – আচ্ছা তোর কান্নায় আমার ঘর তো হবে না। তুই, বড়ই মূর্খ। ব্যবসায়ী-তুই মূর্খ, মূর্খ তোর বাপ। উভয়ে একে অপরকে মারতে থাকে। মারপিট করে শেখচিল্লী ঘরের দিকে পালাল। এবং সেই ব্যবসায়ী ধূলো মিশ্রিত ঘী কে খোলায় উঠিয়ে ঘরের রাস্তা ধরল।

এরকম স্বসামর্থ্য বিনা অসাধ্য মনোরথ করা মূর্খের কাজ এবং যে বিনা পরিশ্রমে পদার্থের প্রাপ্তিতে উৎসাহী হয়, সেই মনুষ্যকে বিদ্বানরা মূর্খ বলেন।

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ।।২।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, বিদুর প্রজাগর, অধ্যায় ৩২)

যে বিনা আহুত হয়ে যেখানে সেখানে সভাদি স্থানে প্রবেশ করে সৎকার ও উচ্চাসন চায় অথবা এমন ভাবে বসে যা সব সৎ পুরুষদের কাছে

আচরণগত ভাবে অপ্রিয় বিদিত হয়, বিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে খুব বেশী আজে বাজে বলে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস করে সুখের ক্ষতি করে সেই মনুষ্য মূঢ়বুদ্ধি এবং মনুষ্য মধ্যে নীচ নামে অভিহিত হয়। ।২। ।

যেখানে এমন,মূঢ় মনুষ্য পঠন পাঠনাদি ব্যবহার করেন সেখানে সুখের দর্শন কোথায় ? কিন্তু দুঃখ পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকে । এইজন্য বুদ্ধিমান লোকেরা এমন এমন মূঢ়ের প্রসঙ্গ বা এর সঙ্গে পঠন পাঠন ক্রিয়াকে ব্যর্থ মনে করে পূর্বোক্ত ধার্মিক বিদ্বানদের প্রসঙ্গ এবং তাদের থেকে বিদ্যাভ্যাস ও সুশীল বুদ্ধিমান বিদ্যার্থীকে কেবল পড়াবে । বিদ্বান ও মূর্খের লক্ষণ বিধায়ক শ্লোক বিদুর প্রজাগরের ৩২ অধ্যায়ে একই জায়গায় লিখিত আছে ।

যারা বিদ্যা পড়বেন ও পড়াবেন তারা নিম্নলিখিত দোষযুক্ত হবেন না –

আলস্য মদমোহৌ চ চাপল্যং গোষ্ঠিরেব চ।
স্তব্ধতা চাভিমনিত্বং তথ্যাত্যগিত্ব মেব চ। ।৩। ।
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থি নাং মতাঃ।
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম। ।৪। ।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যাজৎ সুখম্। ।

আলস্য, অভিমান, নেশা করা, মূঢ়তা, চপলতা, ব্যর্থ, এদিক ওদিকের আজে-বাজে কথা বলা, জড়তা, কখনও পড়া, কখনও না পড়া, অভিমান ও লোভ এই সাত বিদ্যার্থিদের জন্য বিদ্যা বিরোধী দোষ। কেননা যার সুখ-আরাম করার ইচ্ছা তার বিদ্যা কোথায় এবং যার চিত্ত বিদ্যাগ্রহণ করতে ব্যস্ত তার বিষয়সম্বন্ধীয় সুখ আরাম কোথায় ? এইজন্য বিষয় সুখার্থী বিদ্যাকে ত্যাগ করবে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখ থেকে অবশ্যই পৃথক থাকবে। নতুবা পরমধর্মরূপ বিদ্যার পড়া-পড়ানো কখনও হতে পারবে না।

এই শ্লোকও মহাভারত বিদুর প্রজাগর অধ্যায় ৩৯-এ লিখিত আছে।

(প্রঃ) **কেমন মনুষ্য সব বিদ্যার প্রাপ্তি করতে ও করাতে পারেন ?**

(উঃ) ব্রহ্মচর্যস্য চ গুনং শৃণু ত্বং বসুধাধিপ।
আজন্মমরনাদ্যস্তু ব্রহ্মচারী ভবেদিহ।।১।।
ন তস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্যমিতি বিদ্ধি নরাধিপ।
বহ্বয়ঃ কোট্যস্ত্বৃষীনাং চ ব্রহ্মলোকে বসন্ত্যত।।২।।
সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্ধ্ব রেতসাম্।
ব্রহ্মচর্যং দহেদ্রাজন্ সর্বপাপান্যুপাসিতম্।।৩।।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – হে রাজন্। তুমি ব্রহ্মচর্যের গুন শ্রবণ কর। যে মনুষ্য এই সংসারে জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে।।১।। তার কোনো শুভগুন অপ্রাপ্ত থাকে না এমন তুমি জানো। এই ব্রহ্মচর্যের প্রতাপে বহু ঋষি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সর্বানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় বাস করে এবং এই লোকেও বহু সুখ প্রাপ্ত হয়।।২।।

যে নিরন্তর সত্যে নিরত, জিতেন্দ্রিয়, শান্তাত্মা উৎকৃষ্ট, শুভগুণ স্বভাবযুক্ত এবং রোগরহিত পরাক্রম সহিত শরীর, ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বেদাদিও সত্য শাস্ত্র এবং পরমাত্মার উপাসনার অভ্যাস কর্মাদি করেন, তিনি তার সব দুষ্কর্ম ও দুঃখ নষ্ট করে সর্বোত্তম ধর্মযুক্ত কর্ম এবং সব সুখের প্রাপ্তি ঘটান। এবং এই সব গুন দ্বারা মনুষ্য উত্তম অধ্যাপক ও উত্তম বিদ্যার্থী হতে পারে।।৩।।

(প্রঃ) বিদ্যার পাঠ গ্রহণকারী ও পাঠ-দান করী ব্যক্তির মধ্যে বিরোধী ব্যবহার কি কি ?

(উঃ) অশুশ্রূষা ত্বরা শ্লাঘা বিদ্যায়াঃ শত্রবস্থায়ঃ।।

যে বিদ্যা এবং বিদ্বানগণকে সেবা করে না, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে এবং নিজের অথবা অন্য ব্যক্তির প্রশংসায় রত হয়ে যায় – এই তিন প্রকার ব্যক্তি বিদ্যালাভের শত্রু। এইরকম ব্যক্তি যার বিদ্যালাভ করতে চায় অথবা বিদ্যাদানরত হয়, তাদেরকে ত্যাগ কর।

(প্রঃ) শূরবীর কাকে বলে ?

(উঃ) বেদাধ্যয়ন শূরাশ্চ শূরাশ্চাধ্যয়নে রতাঃ।
গুরুশু শ্রষয়া শূরাঃ পিতৃশুশ্রষয়াপরে।।১।।
মাতৃশুশ্রুষয়া শূরা ভৈক্ষ্যশূরাস্তথ্যাপরে।
অরণ্যগৃহবাসে চ শূরাশ্চ্যাতিথি পূজনে।।২।।

যে মনুষ্য বেদাদি শাস্ত্র পড়তে পড়াতে শূরবীর, যে দুষ্টের দলন ও শ্রেষ্ঠদের পালনে শূরবীর অর্থাৎ দৃঢ় উৎসাহী উদ্যোগী, যে নিষ্কপট পরোপকারক অধ্যাপকদের সেবা করে যে শূরবীর, যে নিজ জনকের সেবা করে সে শূরবীর। ।১। । যে মাতার পরিচর্যা করে সে শূর, যে সন্ন্যাসাশ্রমে যুক্ত অতিথিরূপ হয়ে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে পরোপকার করায় ভিক্ষাবৃত্তিতে সে শূর, যে বানপ্রস্থাশ্রমের কর্ম ও গৃহাশ্রমের ব্যবহারে পটু হয় তাকে শূরবীর বলা হয়। তারাই সব সুখ লাভ করে বা করায় এবং অত্যুত্তম হওয়ায় ধন্যবাদের পাত্র হয়। তারা নিজ তনু, মন, ধন, বিদ্যা ও ধর্মাদি হতে শুভ গুণ গ্রহণ করতে সদা উপযুক্ত হয়।

(প্রঃ) **শিক্ষা কাকে বলে ?**

(উঃ) যার দ্বারা মনুষ্য বিদ্যাদি শুভ গুণের প্রাপ্তি ও অবিদ্যাদি দোষ ত্যাগ করে সর্বদা আনন্দিত হতে পারে তাকেই শিক্ষা বলা হয়।

(প্রঃ) **বিদ্যা ও অবিদ্যা কাকে বলে ?**

(উঃ) যার দ্বারা পদার্থের স্বরূপ যথাবৎ জেনে তার থেকে উপকার নিয়ে নিজ ও অন্যের জন্য সব সুখ প্রতিপন্ন করতে পারে তা বিদ্যা এবং যদ্বারা পদার্থের স্বরূপ বিপরীত জেনে নিজের ও অপরের অনুপকার করবে তাকে অবিদ্যা বলা হয়।

(প্রঃ) **মনুষ্যকে বিদ্যার প্রাপ্তি ও অবিদ্যার নাশের জন্য কী কী কর্ম করা উচিত ?**

(উঃ) বর্ণোচ্চারণ থেকে নিয়ে বেদার্থজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মচর্যাদি কর্ম করা যোগ্য।

(প্রঃ) **ব্রহ্মচারী কাকে বলে ?**

(উঃ) যিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিদ্যা হেতু এবং আচার্যকুলে গিয়ে বিদ্যাগ্রহণ হেতু সচেষ্ট হয় তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়।

(প্রঃ) **আচার্য কাকে বলে ?**

(উঃ) যিনি বিদ্যার্থীদেরকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক ধর্মযুক্ত ব্যবহার সহ শিক্ষাপূর্বক বিদ্যা দান দেওয়ার জন্য তনু, মন ও ধন দ্বারা সচেষ্ট হন, তাঁকে আচার্য বলা হয়।

(প্রঃ) **নিজ সন্তানদের জন্য মাতা, পিতা ও আচার্য কী কী শিক্ষা দিবেন ?**

(উঃ) মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ । । শতপথ ব্রাহ্মণ ।

সেই মনুষ্য সৌভাগ্যবান যার জন্ম ধার্মিক, বিদ্বান মাতা-পিতা ও আচার্যের সম্পর্কে হয় । কেননা এই তিনের শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য উত্তম হয় । এরা নিজ সন্তান ও বিদ্যার্থীকে ভালো ভাষা বলা, পান-ভোজন, ওঠা বসা, বস্ত্রধারণ করার, মাতা-পিতা ইত্যাদিকে মান্য করার, তাদের সামনে যথেচ্ছাচারী না হওয়ার, বিরুদ্ধ চেষ্টা না করার জন্য সচেষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিবেন এবং তাদের সামর্থানুযায়ী উত্তম কথা শিখাতে থাকবেন । এই প্রকার পুত্র ও কন্যাকে পাঁচ বা আট বৎসর পর্যন্ত মাতা-পিতা এবং তৎপশ্চাৎ আচার্য শিক্ষা দিবেন ।

(প্রঃ) **যেমন ইচ্ছা তেমন শিক্ষা দিবে কি ?**

(উঃ) না, যারা নিজের পুত্র, কন্যা বা বিদ্যার্থীকে বলবে যে, শোন, আমার পুত্র, কন্যা ও বিদ্যার্থী । তোমার শীঘ্র বিয়ে দেব, তুমি এর শ্মশ্রু-গুম্ফ ধরে টানো, এর খোপা টেনে ওড়নী ফেলে দাও, গালাগালি দাও, এর কাপড় ছিনিয়ে নাও, পাগড়ী বা টুপি খুলে ফেলে দাও, হাসো, খেলো - লাফাও, তোমার বিয়েতে বাজি ফুটবে ইত্যাদি কুশিক্ষা প্রদান করেন, তাদেরকে মাতা-পিতা ও আচার্য মনে করা উচিত নয় এরা সন্তান ও শিষ্যদের চরম শত্রু ও দুঃখজনক । যিনি কুচেষ্টা দেখেও ছেলেদেরকে ধমকান না, দন্ডও দেন না, তারা কেমন করে মাতা-পিতা ও আচার্য হতে পারেন ? কেননা যিনি নিজের সম্মুখে যত্রতত্র বক্‌বক্ করার, নির্লজ্জ হওয়ার, ব্যর্থ চেষ্টাদি করার কুকর্ম থেকে সরিয়ে বিদ্যাদি শুভগুনের জন্য উপদেশ করেন না, তনু, মন, ধন সংযুক্ত না করে উত্তম বিদ্যা ব্যবহারের সেবন না করিয়ে নিজ সন্তানদের সদা নষ্ট করতে থাকেন, তারা মাতা-পিতা ও আচার্য বলে ধন্যবাদের পাত্র কখনও হতে পারেন না যারা নিজ নিজ সন্তান ও শিষ্যকে ঈশ্বরের উপাসনা, ধর্ম, অধর্ম, প্রমাণ, প্রমেয়, সত্য, মিথ্যা, পাপখন্ড, বেদ, শাস্ত্রাদির লক্ষণ ও তার স্বরূপের যথাযথ বোধ করিয়ে ও সামর্থ্যের অনুকূল তাদেরকে বেদশাস্ত্রের বচন কন্ঠস্থ করিয়ে

বিদ্যা পাঠ করারও আচার্য্যের অনুকূল থাকার রীতি জানিয়ে দিবেন, যাদ্বারা বিদ্যা-প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রয়োজন নির্বিঘ্নে সমাধান হয়, তাদেরকে মাতা-পিতা ও আচার্য বলে।

(প্রঃ) **বিদ্যা কী প্রকার এবং কোন কর্ম থেকে হয় ?**

(উঃ) **চতুর্ভি ঃ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগম কালেন স্বাধ্যায় কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেনেতি।।**

– মহাভাষ্য অ০ ১/১/১ আ০ ১।।

বিদ্যা চার প্রকারে আসে – আগম, স্বাধ্যায়, প্রবচন ও ব্যবহারকাল। **'আগমকাল'** তাকে বলে যে যার দ্বারা মনুষ্য অধ্যাপনকারী থেকে সতর্ক হয়ে, ধ্যানপূর্বক বিদ্যাদি পদার্থ গ্রহণ করতে পারে। স্বাধ্যায় তাকে বলে যে, যা পঠন সময়ে আচার্যের মুখ থেকে শব্দ, অর্থ ও তাদের যে সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হয়, এবং সেগুলি একান্ত সুস্থচিত্তে পূর্বাপর বিচার করে হৃদয়ে সঠিক দৃঢ় করতে পারে। **'প্রবচন কাল'** তাকে বলে যে, যার দ্বারা অন্যকে প্রীতিপূর্বক বিদ্যা পড়াতে পারে। **'ব্যবহারকাল'** তাকে বলে সে, যখন যখন নিজ আত্মায় সত্যবিদ্যা প্রতিত হয়, তখন নিশ্চয় করা, এটা করা বা না করা, সেটা ঠিক মতো প্রতিপন্ন হয়ে সেইরকম আচরণ করা সম্ভব হতে পারে। এর চারটি প্রয়োজন এবং অন্যও চার কর্ম বিদ্যাপ্রাপ্তি হেতু প্রয়োজন যথা ঃ– শ্রবন, মনন, **নিদিধ্যাসন** ও সাক্ষাৎকার। **'শ্রবণ'** তাকে বলে যে, আত্মা মনের এবং মন শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত করে অধ্যাপকের মুখ থেকে যা যা অর্থও সম্বন্ধের প্রকাশকারী শব্দ বের হয়, তাকে শ্রোত্র থেকে মন ও মন থেকে আত্মায় সংগ্রহ করতে পারা যায়। **'মনন'** তাকে বলে যা যা শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ আত্মায় সংগৃহীত হয়েছে তার একান্তে সুস্থচিত্ত হয়ে বিচার করা যে, কোন্ শব্দ কী অর্থের সঙ্গে এবং কোন্ অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থাৎ মিল থাকে এবং এই মিলনে কী প্রয়োজন এবং সিদ্ধি ও বিপরীত হওয়ায় কী কী ক্ষতি হয় ? **'নিদিধ্যাসন'** তাকে বলে যে যে শব্দ অর্থও সম্বন্ধ শোনা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে সেগুলি সঠিক কি না ? এই কথার বিশেষ পরীক্ষা করে দৃঢ় নিশ্চয় করা, এবং **'সাক্ষাৎকার'** তাকে বলে যে, যেসব অর্থের

শব্দ ও সম্বন্ধ শোনা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে এবং নিশ্চয় করা হয়েছে তার যথাযথ জ্ঞান ও ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যক্ষ করে ব্যবহারের সিদ্ধির ফলে নিজের ও পরের উপকার করা ইত্যাদি এসব হয় বিদ্যা প্রাপ্তির সাধন।

(প্রঃ) **আচার্যের সঙ্গে বিদ্যার্থী কেমন ব্যবহার করবে এবং কী কী করবে না ?**

(উঃ) মিথ্যা ত্যাগ করে সত্য বলবে, সরল থাকবে, অভিমান করবে না, আজ্ঞাপালন করবে, স্তুতি করবে, নিন্দা করবে না, নিম্ন আসনে বসবে, উচ্চাসনে বসবে না, শান্ত থাকবে, চপলতা প্রকাশ করবে না, আচার্য তাড়না করলে প্রসন্ন থাকবে, ক্রোধ কখনও করবে না, যখন আচার্য কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, তখন হাত জোড় করে নম্র হয়ে উত্তর দেবে, অহংকার করে বলবে না, যখন তিনি শিক্ষা দিবেন তখন একাগ্র চিত্তে শুনবে, হাসাহাসি বা ঠাট্টা করবে না।

শরীর ও বস্ত্র শুদ্ধ রাখবে, কখনও ময়লা করবেনা। যা প্রতিজ্ঞা করবে তা পূর্ণ করবে। জিতেন্দ্রিয় হবে। লাম্পট্য, ব্যভিচারাদি কখনও করবে না। উত্তম জনের সর্বদা সম্মান করবে, অপমান কখনও করবে না। উপকার মেনে কৃতজ্ঞ হবে, উপকার না মেনে কৃতঘ্ন হবে না। পুরুষার্থী হবে, কখনও অলস হবে না। যে যে কর্মে বিদ্যাপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই কর্ম করতে থাকবে। যা মন্দ কর্ম যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক ইত্যাদি বিদ্যাবিরোধী তা ত্যাগ করে সর্বদা উত্তম গুণের কামনা করবে। মন্দ কর্মে ক্রোধ, বিদ্যাগ্রহণে লোভ, সজ্জনদের প্রতি মোহ, দুষ্কর্মে ভয়, সুকর্ম না হলে শোক করে বিদ্যাদি শুভগুণ দ্বারা আত্মা ও বীর্যাদি ধাতুর রক্ষা দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে শরীরের বল সর্বদা বৃদ্ধি করতে থাকবে।

(প্রঃ) **আচার্য বিদ্যার্থিদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন ?**

(উঃ) যে প্রকার বিদ্যার্থী বিদ্বান, সুশীল, নিরভিমানী, সত্যবাদী, ধর্মাত্মা, আস্তিক, নিরলস, উদ্যোগী, পরোপকারী, বীর, ধীর, গম্ভীর, পবিত্র, আচরণ, শান্তিযুক্ত জিতেন্দ্রিয়, ঋজু, প্রসন্নবদন হয়ে মাতা-পিতা, আচার্য, অতিথি, বন্ধু, মিত্র, রাজা, প্রজাদির প্রিয় হবে, যখন কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবে তখন যা তার মুখ থেকে অক্ষর, পদ, বাক্য বের

হবে তা শান্ত হয়ে শুনে প্রত্যুত্তর দিবে। যখন কেউ কুচেষ্টা, মলিনতা, নোংরা বস্ত্রধারণ, ওঠা-বসায় বিপরীত আচরণ, নিন্দা, ঈর্ষা, দ্রোহ, বিবাদ, কলহ, গোলমাল, কারও উপর মিথ্যা দোষ লাগানো, চুরি, ব্যভিচার, অনভ্যাস, আলস্য, অতিনিদ্রা, অতিভোজন, অতিজাগরণ, ব্যর্থ ক্রীড়া, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা, বিষয়সেবন, কুব্যবহারের কথা বলা বা শোনা, দুষ্টের সঙ্গ করা, ইত্যাদি দুষ্ট ব্যবহার করবে তখন তাকে অপরাধ অনুযায়ী কঠিন শাস্তি দিবেন। এর প্রমান –

সামৃতৈঃ পানিভির্ঘ্নন্তি গুরুবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।
লালনাশ্রয়িনো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িনো গুনাঃ।।১।।

মহাভাষ্য অ০৮/পা০১/সূ০৮/আ০১।।

আচার্যরা নিজ বিদ্যার্থীদেরকে বিদ্যা ও সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেমভাবপূর্বক নিজ হাতে তাড়না করে থাকেন কেননা সন্তান ও বিদ্যার্থীদের যত লালন হয় ততই তারা নষ্ট হয় আর যত তাড়না হয় ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল, কেননা তাতে তাদের সংশোধন হয়। কিন্তু এমন তাড়না করবেন না যাতে তাদের অঙ্গভঙ্গ হয় অথবা মর্মে আঘাত লাগে বা তারা ব্যথায় ভুগতে থাকে।

(প্রঃ) **পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যং, ন পাঠ তবং তদপি মর্ত্তব্যং দন্তকটাকটেতি কিং কর্তব্যম ?** কলহকারী উবাচ – কলহকারী বলে, যে পড়ে সে মরে যে না পড়ে সেও মরে। তাহলে শুধু দন্ত কটমট করে কি লাভ ?

(উঃ) ন বিদ্যয়া বিনা সৌখ্যং নরানাং জায়তে ধ্রুবম্।
অতো ধর্ম্মার্থমোক্ষেভ্যো বিদ্যাভাসং সমাচরেৎ।।১।।

সজ্জন উবাচ – সজ্জন বলেন যে, শোন ভাই কলহকারী, তুমি য জানো সেটা বিদ্যার ফল নয় যে, বিদ্যা পড়লে জন্ম-মরণ, চোখ দিয়ে দেখা কান দিয়ে শোনা ইত্যাদি ঈশ্বরীয় নিয়ম অন্যথা হয়ে যাবে কিন্তু বিদ্যা দ্বার যথার্থ জ্ঞান হওয়ায় যথাযোগ্য ব্যবহার করা ও করানোয় আপনি এব অন্যে আনন্দযুক্ত হবেন – এটাই বিদ্যার ফল। কেননা বিনা বিদ্যায় কোে মনুষ্য নিশ্চল সুখ লাভ করতে পারে না, কারো অল্পক্ষণের জন্য সুখ ন

হওয়ার মতন। কারও সামর্থ্য নেই যে, অবিদ্বান হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের স্বরূপ যথাযথ জেনে প্রতিপন্ন করতে পারে। এই জন্য সকলের উচিত যে, এর সিদ্ধির জন্য বিদ্যার অভ্যাস তনু, মন, ধন দ্বারা করবেন ও করাবেন।

(কলহকারী) আমরা দেখতে পাই যে, বহু মনুষ্য বিদ্যা শিক্ষা করেও দরিদ্র ও ভিক্ষা করে এবং বিনা পড়াশুনা করেও অনেক রাজ্য ধনাদির আনন্দ ভোগ করে থাকে।

সজ্জন – শোন প্রিয়! সুখ-দুঃখের যোগ আত্মাতেই হয়, যেখানে বিদ্যারূপ সূর্যের অভ্যাস থাকবেই, সুখের কথা বলার কী আছে? এবং যেখানে বিদ্যাসূর্য উদয় হয়ে অবিদ্যার অন্ধকারকে নষ্ট করে দেয়, সেই আত্মায় সর্বদা আনন্দের যোগ এবং দুঃখের কোনো লেশ থাকে না। কলহকারী এই শুনে চুপ হয়ে গেল।

(প্রঃ) **আচার্য কোন রীতিতে বিদ্যাও সুশিক্ষা গ্রহণ করাবেন এবং বিদ্যার্থীরা গ্রহণ করবে?**

(উঃ) আচার্য সমাহিত হয়ে এমন রীতিতে বিদ্যা ও সুশিক্ষা দিবেন যার দ্বারা তার আত্মার ভিতর সুনিশ্চিত অর্থ হয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন চেষ্টা বা কর্ম কখনও করবেন না যা দেখে বা করে বিদ্যার্থী অধর্মযুক্ত হয়ে যায়।

দৃষ্টান্ত – হস্তক্রিয়া, যন্ত্র, কলাকৌশল বিচার ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যার্থীদের আত্মায় সত্য এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করাবেন যেন একটা জানলে সহস্রটা বিষয় যথাবিধি জানতে পারে। নিজের আত্মায় এই কথা মনে রাখবেন যে প্রকারে সংসারে বিদ্যাও ধর্মাচরণের বৃদ্ধি এবং আমার দ্বারা পড়ানো মনুষ্য অবিদ্বান ও কুশিক্ষিত হয়ে আমার নিন্দার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় এবং আমি বিদ্যার বাধক এবং অবিদ্যা বৃদ্ধির হেতু না গণ্য হই। এমন না হয় যে, সর্বাত্মা পরমেশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাবের সঙ্গে আমার গুণ, কর্ম, স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাকে মহাদুঃখ ভোগ করতে হয়। পরম ধন্য সেই সব মনুষ্য যারা নিজ আত্মার সমান সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ এবং অন্য মনুষ্যকে জেনে ধার্মিকতা কখনও ত্যাগ করেনা, ইত্যাদি উত্তম ব্যবহার

আচার্যরা নিত্য করতে থাকবেন। বিদ্যার্থীরাও যে কর্মে আচার্যের প্রসন্নতা হয়, সেইরকম কর্ম করবে। যাতে তার আত্মা সন্তুষ্ট হয়ে এই কামনা করে যে, এরা বিদ্যাযুক্ত হয়ে সর্বদা প্রসন্ন থাকুক। রাত-দিন বিদ্যার চিন্তায় মগ্ন থেকে একে অন্যের সঙ্গে প্রেমপূর্বক পরস্পর বিদ্যা বৃদ্ধি করতে থাকুক। যেখানে বিষয় বা অধর্মের চর্চাও হতে থাকে সেখানে কখনও দাঁড়াবে না। যেখানে বিদ্যাদি ব্যবহার এবং ধর্মের ব্যখ্যান হতে থাকে সেখান থেকে নড়বে না। আহারাদি এমন নিয়মে করবে যেন তা থেকে রোগ, বীর্যহানি বা, প্রমাদ না ঘটে। যা বুদ্ধি নাশ করায় সেই পদার্থ কখনও গ্রহণ করবে না, কিন্তু যা জ্ঞানবৃদ্ধি ও রোগনাশকারী পদার্থ তার সেবন সর্বদা করবে। নিত্যপ্রতি পরমেশ্বরের ধ্যান, যোগাভ্যাস, বুদ্ধির বৃদ্ধি, সত্যধর্মের নিষ্ঠা এবং অধর্মের সংস্পর্শ সর্বথা ত্যাগ করবে। যা পড়ায় বিঘ্নরূপ কর্ম তাকে ছেড়ে পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত করবে ইত্যাদি উভয়ের গুন কর্ম।

(প্রঃ) **সত্য ও অসত্যের নিশ্চয় কী প্রকারে হয় কেননা যা একজন সত্য বলে অন্য জন তাকে মিথ্যা বলে। তা নির্ণয় করার নিশ্চিত সাধন কী কী ?**

(উঃ) পাঁচটি সাধন। **প্রথম** - ঈশ্বর তার গুণ, কর্ম, স্বভাব ও বেদবিদ্যা। **দ্বিতীয়** - সৃষ্টিক্রম, **তৃতীয়** - প্রত্যক্ষাদি অষ্ট প্রমাণ, **চতুর্থ** - আপ্তপুরুষদের আচার, উপদেশ, গ্রন্থ ও সিদ্ধান্ত এবং **পঞ্চম** –স্বীয় আত্মার সাক্ষ্য, অনুকূলতা, জিজ্ঞাসুতা, পবিত্রতা ও বিজ্ঞান।

১. **ঈশ্বরাদি দ্বারা পরীক্ষা করা** অর্থাৎ যা ঈশ্বরের ন্যায়াদি গুণ যা পক্ষপাতরহিত সৃষ্টি রচনা করার কর্ম ও সত্য, ন্যায়, দয়ালুতা, পরোপকারিতাদি স্বভাব ও বেদোপদেশ দ্বারা সত্য ও ধর্ম স্থির হয় তাই সত্য ও ধর্ম এবং যা অসত্য ও অধর্ম স্থির হয়, তাই অসত্য ও অধর্ম। যেমন – কেউ যদি বলে যে, বিনা কারণ ও কর্তা দ্বারা কার্য হয় সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জানবে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যা সৃষ্টি রচনাকারী বস্তু সেটা ঈশ্বর ও তার গুণ, কর্ম, স্বভাব, বেদ ও সৃষ্টিক্রম দ্বারাই নিশ্চিত জানা যায়।

২. **সৃষ্টিক্রম** তাকে বলে যে সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ সৃষ্টির গুণ, কর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধে তা মিথ্যা এবং যা অনুকূল তাকে সত্য বলে। কেউ যদি

বলে যে, বিনা মাতা-পিতার সন্তান, কর্ণ দিয়ে দেখা, চক্ষু দিয়ে বলা ইত্যাদি হয়েছে, সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে হওয়ায় তা মিথ্যা এবং মাতা-পিতা থেকে সন্তান, কর্ণ দিয়ে শ্রবণ ও চক্ষু দিয়ে দর্শন ইত্যাদি সৃষ্টিক্রমের অনুকূল হওয়ায় সত্য।

৩. **'প্রত্যক্ষাদি অষ্ট প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা'** করা তাকে বলে যে, যা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঠিক নির্ধারিত হয় তাই সত্য এবং যা বিরুদ্ধ তাকে মিথ্যা বুঝতে হবে। যেমন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করলো – এটা কী ? দ্বিতীয় জন উত্তর দিল – পৃথিবী। এটা **প্রত্যক্ষ**। একে দেখে এর কারণের নিশ্চয় করা **অনুমান**। যেমন বিনা নির্মানকারীর গৃহ তৈরী হতে পারে না সেইরূপ সৃষ্টির নির্মাণকর্তা ঈশ্বরও বিরাট কারিগর। এই দৃষ্টান্ত **উপমান** এবং সত্যোপদেষ্টাদের উপদেশ তা **শব্দ**। ভূতকালস্থ পুরুষদের চেষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি পদার্থের বৃত্তান্ত এইগুলি **ঐতিহ্য**। একটা কথা শুনে অন্য কথা না শুনে, প্রসঙ্গমাত্র জেনে অন্য কথা জেনে যাওয়া এ **অর্থাপত্তি**। কারণ থেকে কার্য হওয়া ইত্যাদিকে **সম্ভব**, আর কেউ কাউকে বললো – জল নিয়ে এসো। সে সেখানে জলের অভাব দেখে তর্কের মাধ্যমে জানতে পারে জল কোথায় এবং সেখান থেকে জল নিয়ে এসে দেয়। একেই অভাব প্রমাণ বলে। এই অষ্ট প্রমাণ থেকে যা বিপরীত না হয় তাকে সত্য এবং যা বিরুদ্ধ তাকে মিথ্যা জানবে।

৪. **'আপ্তপুরুষদের আচরণ ও সিদ্ধান্ত থেকে পরীক্ষা'** করা তাকে বলে যে, যারা সত্যবাদী, সত্যকারী, সত্যমানী, পক্ষপাত শূন্য, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্বান সকলের জন্য চেষ্টা করেন, তাদের ধার্মিক ব্যক্তিরা আপ্ত পুরুষ বলে। তাদের উপদেশ, আচরণ, গ্রন্থ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে যা যুক্ত তাই সত্য এবং যা বিপরীত তাই মিথ্যা। **'আত্মা দিয়ে পরীক্ষা'** তাকে বলে যে, যা আত্মা নিজের জন্য চায়, তাই সকলের জন্য চাওয়া, আর যা না চায়, তার কারো জন্য না চাওয়া, যেমন আত্মায় তেমন মনে, যেমন মনে সেইরূপ ক্রিয়ায় পরিণত করার ইচ্ছা, শুদ্ধ ভাবও বিদ্যার নেত্র দিয়ে দেখে সত্য ও অসত্যের নিশ্চয় করা দরকার। এই পাঁচ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপন-অধ্যয়নকারী এবং সব মনুষ্য সত্যাসত্যের নির্ণয় করে ধর্মের এবং অধর্মের পরিত্যাগ করবেন ও করাবেন ?

(প্রঃ) **ধর্ম ও অধর্ম কাকে বলে ?**

(উঃ) যা পক্ষপাত রহিত ন্যায়, সত্যগ্রহণ, অসত্যের পরিত্যাগ, পাঁচ পরীক্ষার অনুকূল আচরণ, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন, পরোপকার করা **ধর্ম**, এর বিপরীত **অধর্ম** বলে। কেননা যা সকলের অবিরুদ্ধ তাই ধর্ম এবং যা পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ সেটাকে অধর্ম বলা হবেনা কেন ? দেখো ! কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে তোমার মত কী ? সে উত্তর দেয় – যা আমি মানি। পুনরায় পূর্ব ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি যা মানি সেটা কী ? সে বলল – অধর্ম। এই পক্ষপাত হল অধর্মের স্বরূপ আর যখন, তৃতীয় ব্যক্তি এই দুই জনের নিকট জিজ্ঞাসা করে সত্য বলা ধর্ম কি অসত্য ? তখন উভয়ে উত্তর দিল যে, সত্য বলা ধর্ম ও অসত্য বলা অধর্ম, এরই নাম ধর্ম জানবে। কিন্তু এখানে পাঁচ পরীক্ষার যুক্তি দ্বারা সত্য ও অসত্যের নিশ্চয় করানো প্রয়োজন।

(প্রঃ) **যখন সভা ইত্যাদিতে যাবে তখন কেমন ব্যবহার করবে ?**

(উঃ) যখন সভায় যাবে তখন দৃঢ় নিশ্চয় করে নিবে যে, আমি সত্যকে জিতাব এবং অসত্যকে হারাব। অভিমান করবে না। নিজেকে বড়ো মনে করবে না। নিজের কথা কেউ খন্ডন করলে তার উপর ক্রুদ্ধ বা অপ্রসন্ন হবে না। কেউ যদি বলে তার কথন ধ্যানপূর্বক শুনে তার মধ্যে কিছু অসত্য থাকলে, সেই অংশের খন্ডন অবশ্য করে এবং যা সত্য প্রসন্নতাপূর্বক অবশ্যই গ্রহণ করবে। বড়োছোট গননা করবে না। ব্যর্থ বকবক করবে না। কখনও মিথ্যার পক্ষ অবলম্বন করবে না এবং সত্যকে কখনও ত্যাগ করবে না। এমন রীতিতে বসবে বা উঠবে যাতে কেউ মন্দ না ভাবে। সর্বহিতের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যার দ্বারা সত্যের বৃদ্ধি ও অসত্যের নাশ হয় তাই করবে। সজ্জনদের সঙ্গ এবং দুষ্টদের পরিত্যাগ করবে। যা প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সত্যের বিরুদ্ধে না হয়, এবং তা সর্বদা যথাযথ পূর্ণ করবে। ইত্যাদি কর্ম সব সভা ইত্যাদিতে ব্যবহারে প্রয়োগ করবে।

(প্রঃ) **জড়বুদ্ধি ও তীব্রবুদ্ধি কাকে বলে ?**

(উঃ) যে নিজে তো বুঝতে পারে না অন্যে বোঝালেও বোঝে না সে জড়বুদ্ধি এবং যে বোঝালে শীঘ্র বুঝে যায় এবং অল্প বোঝালে অনেক বুঝে যায় তাকে তীব্রবুদ্ধি বলে।

এখানে মহাজড় ও বিদ্বানদের দৃষ্টান্ত শোন, জনৈক রামদাস বৈরাগী

শিষ্য ভূপালদাস পাঠ করতে করতে কুঁয়ার পারে জল ভরতে গেল। সেখানে একজন পন্ডিত বসে ছিল। তিনি অশুদ্ধ পাঠ শুনে বললেন – তুমি "**শ্রী গণেসাজনম**" এইরকম মুখস্থ করছো এটা ঠিক নয় কিন্তু '**শ্রী গণেশায় নমঃ**' এমন শুদ্ধ পাঠ হবে। তখন সে বলে – আমার মহন্ত বড়ো পন্ডিত। তিনি যেমন আমাকে বলেছেন আমি সেই রকম মুখস্থ করবো। সে জল ভরে নিজের গুরুর কাছে গিয়ে বলল। সে জল ভরে নিজের গুরুর কাছে গিয়ে বলল – মহারাজ! একজন বামুন আমার পাঠকে অশুদ্ধ বলছে। তখন গুরু শিষ্যকে বলল – যা সেই বামুনকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়, আমার শিষ্যকে কেন প্রলোভিত করবে এবং শুদ্ধকে অশুদ্ধ বলবে ? শিষ্য গিয়ে পন্ডিতকে ডেকে নিয়ে আসে। মহন্ত পন্ডিতকে বলে তুমি এর কত প্রকার পাঠ জানো ? পন্ডিত – এক প্রকারের। **মহন্ত** – তুমি কিছুই জানো না দেখ, আমি তিন প্রকার পাঠ জানি। এক – স্ত্রী গনেসাজনম, দুই – স্ত্রী গনেসাপ নম, তিন – স্ত্রী গনেসায় নম।

পন্ডিত - মহন্ত মশাই। আপনার পাঠে পাঁচটি দোষ। প্রথম 'শ' কে 'ম' কে 'ন', 'শা'-কে 'সা', 'য়'-কে 'জ' বলা এবং বিসর্গ না বলা পাঁচটি অশুদ্ধি।

মহন্ত – যা-যা, গুরুর ঘরে সব শুদ্ধ। পন্ডিত চুপ করে চলে আসে কেননা '**সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রকথিতং মূর্খস্য নৈব ক্বচিৎ**'। সকলের ঔষুধ শাস্ত্রে কথিত আছে কিন্তু শঠ মানুষের ওষুধের কথা শাস্ত্রে নেই। এমন পাঠকারী মনুষ্য থেকে দূরে থাকবে। তারা যদি সংশোধিত হতে চায়, তাহলে বিদ্বান উপদেশ করে তাদের অবশ্যই সংশোধন করবেন।

(প্রঃ) **মাতা-পিতা, আচার্য ও অতিথি যদি অধর্ম করে এবং করার উপদেশ করে তাহলে মানা উচিত কি না ?**

(উঃ) কখনও নয়। কুমাতা, কুপিতা সন্তানকে মন্দ উপদেশ দিচ্ছেন যে – ছেলেমেয়েরা তোদের শীঘ্র বিয়ে দিয়ে দিব, কোনো জিনিস পেলে উঠিয়ে আনবে। কেউ গালাগালি দিলে তাকে পঞ্চাশটা গালি দেবে। লড়াই, ঝগড়া, খেলা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ভাং, মদ্য গাঁজা, চরস, আফিং, খাওয়া - দাওয়া করায় কোনো দোষ নেই, কেননা এটা আমাদের

পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। এর প্রমান শোন 'কুলধর্ম্মঃ সনাতনঃ' যা কুলে
ধর্ম প্রথম থেকে চলে আসছে, তা করতে কিছু দোষ নেই। সুসন্তান বলে
তুমি যে আমাদের শীঘ্র বিয়ে করা, কারো জিনিস উঠিয়ে আনা ইত্যাদি
করতে বলছ সেটা দুষ্ট মনুষ্যের কর্ম, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য পাল
করে পূর্ণ বিদ্যা পাঠ করে স্বয়ংবর অর্থাৎ পূর্ণ যুবাবস্থায় উভয়ের প্রসন্ন
সহ বিবাহ করা, কারো কোটি টাকার জিনিস জঙ্গলে পড়ে থাকতে কখন
গ্রহণ করতে মনে ইচ্ছা না উদিত হওয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষরাই এই কর্ম ক
থাকেন, যা তোমাদের উত্তম কর্মাদি উপদেশ, সেগুলি আমরা গ্রহণ কর
অন্যগুলি নয়। কিন্তু তোমরা যেমনই হও, তনু, মন, ধন দিয়ে তোমা
সেবা করা আমাদের পরম ধর্ম, কেননা যেমন তোমরা বাল্যাবস্থায় আমা
সেবা করেছ সেইরূপ আমরা তোমাদের সেবা কেন করব না? কুসন্ত
বলেছ – শ্রেষ্ঠ মাতা-পিতা, আচার্য, অতিথিকে অভাগা সন্তান বলে
আমাদেরকে খুব খাওয়াও খুব খেলতে দাও, আমাদের জন্য আয় কর, য
তোমরা মরে যাবে তখন আমাদেরই সব কাজ করতে হবে। শীঘ্র বিয়ে দি
দাও। নতুবা আমরা এদিক ওদিক লীলা করে বেড়াব। বাগানে গিয়ে না
তামাশা করব বা বৈরাগী হয়ে যাব। পড়তে বড়ো কষ্ট হয়, আমাদের প
কী হবে? কেননা, আমাদের সেবা করার জন্য তোমরাই তো আ
আমাদের রঙ্গ-বিলাস, শিকার, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আশ
খুব দিতে থাকবে নয়তো আমরা যখন জোয়ান (যুবক) হব, তোমাদের দে
নেব। 'দন্ডাদন্ডি, নখানখি, কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, যুদ্ধমেব অন্যৎ কিম
'এমন সন্তানকে দুষ্ট বলা হয়। উত্তম মাতা-পিতা তাদেরকে বলেন – '
তোমরা এখন তোমাদের পড়ার, গননা করার, সৎ সঙ্গ করার, ভালো বা
কথা শেখার, বীর্য নিগ্রহ ও আচার্যাদির সেবা করার, বিদ্বান হওয়ার, শ
ও আত্মাকে পূর্ণ যুবাবস্থা ইত্যাদি কর্ম করার সময়। সময় গেলে প
অনুতাপ করতে হবে। পুনরায় এরকম সময় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কে
যতক্ষণ আমরা ঘরের এবং তোমার খাওয়া বা পান করার ব্যবস্থা ক
ততক্ষণ তুমি সুশিক্ষা গ্রহণ করে সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যারূপী ধনকে সঞ্চিত কর
এই অক্ষয় ধন যা চোরেও নিতে পারে না, ভারী হয় না এবং যত দান ক
ততই বেশী বাড়তে থাকে। এটা থাকলে যেখানে থাকবে সুখ ও প্রতিষ্ঠা

করবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্পর্কীয় কর্মকে জেনে প্রমাণ করতে পারবে। আমরা যখন তোমাকে বিদ্যারূপ শ্রেষ্ঠগুনে অলংকৃত দেখব, তখন আমরা পরম সন্তুষ্টি লাভ করব। এবং যদি তোমরা কোন দুষ্ট কাজ কর তাহলে আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করব। কেননা আমাদের কোন পাপের ফলে এমন দুষ্ট সন্তান পেয়েছি। তুমি কি দেখছ না যে মনুয্যের রাজ্য, ধন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা বিনা তা নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সুশিক্ষা যুক্ত দরিদ্রও রাজ্য ও ঐশ্বর্য ভোগ করে। তোমাদের উচিত যে –

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরানি। ।১। ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রপাঠকে ৭। অনুবাক ১১। ।

যা আমাদের উত্তম চরিত্র তাই করবে এবং আমরা যদি কুকর্ম করি, তামরা কখনও তা করবে না ইত্যাদি উত্তম উপদেশ ও কর্ম করেন যে সব মাতা-পিতা ও আচার্য তারাই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়।

(প্রঃ) **রাজা প্রজা ও ইষ্ট মিত্রাদি সহ কেমন ব্যবহার করবে ?**

(উঃ) রাজ পুরুষ প্রজার জন্য সুমাতা ও সুপিতার সমান এবং প্রজাপুরুষ রাজসম্বন্ধে সুসন্তান সদৃশ ব্যবহার করে পারস্পরিক আনন্দ বৃদ্ধি করবে। মিত্র মিত্র সহ সত্য ব্যবহারের জন্য আত্মাসম প্রীতি পূর্বক ব্যবহার করবে কিন্তু অধর্ম হেতু নয়। প্রতিবেশীর প্রতি এমন ব্যবহার করবে যেমন নিজের শরীরের প্রতি করা হয়। সেইরূপ মিত্রাদির জন্যও কর্ম করবে। স্বামি সেবকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে যেমন নিজের হস্তপদাদি অঙ্গ রক্ষা হেতু করে, সেবক স্বামীর প্রতি এমন ব্যবহার করবে যেমন অন্ন, জল, বস্ত্র গৃহাদি শরীরের রক্ষা হেতু হয়।

(প্রঃ) **ব্রহ্মচর্যের কী কী নিয়ম ?**

(উঃ) কমপক্ষে ২৫ বৎসর পর্যন্ত পুরুষ এবং ষোলো বর্ষ পর্যন্ত কন্যাকে ব্রহ্মচর্য সেবন অবশ্য করানো দরকার এবং আটচল্লিশ বর্ষ থেকে অধিক পুরুষ এবং চব্বিশ থেকে অধিক কন্যা ব্রহ্মচর্যের সেবন করবে না। কিন্তু এর পর গৃহাশ্রমের সময়।

(প্রঃ) প্রমাদী ব্রুতে – পাগল মনুষ্য বলে যে, শুনুন, কন্যাদের অধ্যয়ন করা শাস্ত্রোক্ত নয় কেননা যখন তারা শিক্ষিত হবে তখন মূর্খ

পতির অপমান করে এদিক ওদিক চিঠি পাঠিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রী
স্থাপন পূর্বক ব্যাভিচার করতে থাকবে।

(উঃ) সজ্জনঃ সমাধত্তে – শ্রেষ্ঠ পুরুষ এর উত্তর দেয় – শুনু
তোমার বলার এই অভিপ্রায় যে, কোনো পুরুষকেও অধ্যয়ন করা উচি
নয় কেননা সেও শিক্ষিত হয়ে মূর্খ স্ত্রীর অপমান ও গাড়ি চালিয়ে অ
স্ত্রীদের সহ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকবে।

(প্রঃ) প্রমাদীহ্যাঁ, পুরুষের অধ্যয়ন না করলে ভাল। কেননা শিক্ষি
মনুষ্য চাতুর্যের ফলে অন্যকে প্রতারিত করে অপমান করবে এবং নিজে
স্বার্থসিদ্ধি করবে।

(উঃ) সজ্জনশুনুন মশাই। সে বিদ্যা পড়ার দোষ নয় কিন্তু আপন
মতো মনুষ্যের সঙ্গ দোষ এবং যে পড়া-পড়ানো ধর্ম ও ঈশ্বরের বিদ্য
বিরুদ্ধ তা প্রায়ই কুকর্মের কারণে লক্ষিত হয়। যে পড়া-পড়ানো উ
বিদ্যাযুক্ত সেই সকলের সুখ ও উপকারের জন্য হয়ে থাকে।

(প্রঃ) **কন্যাদের অধ্যয়ন করাতে বৈদিক প্রমাণ কোথায় ?**

(উঃ) শুনুন প্রমাণ –

ব্রহ্মচর্যেনি কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।।

অথর্ব বেদ কা০ ১১।অ০৩।সূ৫।মন্ত্র১

অর্থ – যেমন ছেলেরা ব্রহ্মচর্য পালন, করে সেইরূপ মেয়েরা
ব্রহ্মচর্য পালন করে বর্ণোচ্চারন থেকে নিয়ে বেদপর্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করে প্রা
হয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক যুবাবস্থাসম্পন্ন বিদ্বান্ পতিকে বেদোক্ত রীতিতে গ্র
করবে।।১।।

অধর্মী ভিন্ন কোনো এমন মনুষ্য হবে যে কোনো পুরুষ বা মহিলা
বিদ্যা পড়তে বাধা দান করে মূর্খ করে রাখতে চায় ? বেদোক্ত প্রমাণে
অপমান করে ব্যক্তিগত কল্যাণ করতে চায় ?

(প্রঃ) **বিদ্যা কী কী ক্রমে প্রাপ্ত হতে পারে ?**

উঃ) বর্ণোচ্চারণ, ব্যবহারের শুদ্ধি, পুরুষার্থ, ধার্মিক, বিদ্বানের স
বিষয়কথা প্রসঙ্গের ত্যাগ সুবিচারপূর্বক ব্যাকরণাদি শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধ
যথাযথ জেনে, উত্তম ক্রিয়া করে সাক্ষাৎ করতে থাকবে। যে বিদ্যার জ

যে সাধনরূপ সত্য গ্রন্থ, সেইগুলি পাঠ করে বেদাদি পাঠ যোগ্য গ্রন্থের অর্থ জ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি কর্ম শীঘ্র বিদ্বান্ হওয়ার সাধন।

(প্রঃ) **অধ্যয়ন না করলে মনুষ্যের কী গতি হবে ?**

(উঃ) দুইটি, একটা ভালো এবং অন্যটা মন্দ, ভালো তাকে বলে, যে মনুষ্যের বিদ্যা পড়ার সামর্থ্য নেই কিন্তু সে ধর্মাচরণ করতে চায় তাহলে বিদ্বানদের সঙ্গ এবং স্বীয় আত্মার পবিত্রতা ও অবিরুদ্ধতা দ্বারা ধর্মাত্মা অবশ্য হতে পারে। কেননা সব মনুষ্যের বিদ্বান হওয়া সম্ভবই নয়, কিন্তু ধার্মিক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব। যেমন নিজের জন্য সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ ত্যাগ মান্য হওয়ায়, অপমান না হওয়ার অভিলাষ করে, তাহলে অন্যের জন্য কেন করবে না ? যখন কারো উপর চুরি বা মিথ্যা মামলা আরোপ করা হয় তখন তার কি ভালো লাগে এবং যে কর্ম করতে স্বীয় আত্মায় শঙ্কা, লজ্জা ও ভয় হয় না, সে ধর্ম কি কারো বিদিত হয় না ? কেউ যদি আত্মবিরোধ অর্থাৎ আত্মায় অন্য এবং বানীতে অন্য এবং ক্রিয়ায় বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে সে অধর্মী এবং যার যেমন আত্মায় সেই রূপ বানী এবং যে রূপ বানীতে সেরূপ ক্রিয়ায় আচরিত হয়, সে কি ধর্মাত্মা নয় ? প্রমান –

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।

যজুর্বেদ অ০ ৪০। মন্ত্র ৩।।

অর্থ – (যে) সে (আত্মহনঃ) আত্মহত্যাকারী অর্থাৎ আত্মস্থ জ্ঞানের বিরুদ্ধে বলে মানে ও করে (তে) তারাই (লোকাঃ) লোক (অসূর্য্যা নাম) অসূর অর্থাৎ দৈত্য, রাক্ষস নামধারী মনুষ্য এবং তারাই (অন্ধেন তমসাবৃতাঃ) অত্যন্ত অধর্মরূপ অন্ধকার যুক্ত হয়ে জীবিত থাকে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (তান্) ও দুঃখদায়ক দেহাদি পদার্থকে (অভিগচ্ছন্তি) সর্বথা প্রাপ্ত হয় এবং যে আত্মরক্ষক অর্থাৎ আত্মার অনুকূলেই বলে, মানে ও আচরণ করে, সেই সব মনুষ্য বিদ্যারূপ শুদ্ধ প্রকাশ যুক্ত হয়ে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ নামে প্রখ্যাত হয়। তারাই সর্বদা সুখ প্রাপ্ত হয়ে মরার পরেও আনন্দযুক্ত দেহাদি পদার্থ প্রাপ্ত হয়।

(প্রঃ) **বিদ্যা ও অবিদ্যা কাকে বলে ?**

(উঃ) যার দ্বারা পদার্থ যথাবৎ জেনে ন্যায়যুক্ত কর্ম করা হয় তা বিদ্যা এবং যার দ্বারা কোনো পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান না হয়ে অন্যায়রূপ কর্ম করা হয়, তাকে অবিদ্যা বলে।

(প্রঃ) **ন্যায় ও অন্যায় কাকে বলে ?**

(উঃ) যা পক্ষপাত রহিত সত্যাচরণ করা, তা ন্যায় এবং যা পক্ষপাত পূর্বক মিথ্যাচরণ করা, তাকে অন্যায় বলে।

(প্রঃ) ধর্ম ও অধর্ম কাকে বলে ?

(উঃ) যে ন্যায়াচরণ সকলের হিতকর্ম করা। তাকে ধর্ম এবং যে অন্যায়াচরণ সকলের অহিত কর্ম করে তাকে অধর্ম জানবে।

মহামূর্খের লক্ষণ –

জনৈক প্রিয়দাসের শিষ্য ভগবান দাস গুরুর নিকট বারো বৎসর পর্যন্ত পাঠ অধ্যয়ন করে, একদিন সে জিজ্ঞাসা করল – মহারাজ। আমি সংস্কৃত বলতে পারিনা। গুরু বলল – শোন হে। পড়লে – পড়ালে বিদ্যা হয় না কিন্তু গুরুর কৃপায় হয়, যখন গুরু সেবায় প্রসন্ন হন তখন যেমন চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরের সমস্ত পদার্থ শীঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তারা এমন যুক্তি বলে দেবেন যে, হৃদয়ের কপাট খুলে সব পদার্থবিদ্যা তৎক্ষনাৎ করায়ত্ত হয়। শোন – সংস্কৃত বলার সহজ যুক্তি।

ভগবানদাস – মহারাজ। সেটা কী ? গুরু – সংসারে যত শব্দ সংস্কৃত বা দেশভাষায় হয় তার সঙ্গে এক একটা 'ং' অনুস্বার যোগ করলে সব শুদ্ধ সংস্কৃত হয়ে যায়। ভগবানদাস – আচ্ছা তাহলে মহারাজ, লোটা, জল, রুটি, ডাল, শাক ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে 'ং' যোগ করলে কেমন সংস্কৃত হয়ে যায় ? গুরু – দেখো, লোংটাং জংলং, রুংটিং, ডাংলং, শাংকং ইত্যাদি। শিষ্য বলল – বাহ্-বাহ্ ! গুরু বিনা মুহূর্ত মধ্যে পূর্ণ বিদ্যা কে বলতে পারে। ভগবানদাস নিজের আসনে এসে চিন্তা করে এই শ্লোক তৈরী করে –

বাংপং আংজাং নমংস্কৃত্যং পরং পাংজং তাংথৈংবং চং।
মংয়াং ভংগংবাংনং দাংসেংনং গীংতাং টীংকাং কংরোংম্যংহংম্।।

যখন সে প্রাতঃকালে উঠে হরষিত হয়ে গুরুকে শ্লোক শোনাল তখন

প্রিয়দাস মশাইও অত্যন্ত খুশী হলেন যে, শিষ্য যদি এমন হয় তবে তোমার মতো গুরুর বচনের উপর বিশ্বাসী হবে এবং গুরু হবে আমার মতন। এমন মনুষ্যের ঔষধ কী ? আলাদা থাকা ছাড়া।

(প্রঃ) **বিদ্যা পড়ার সময় বা পড়ে কোন অন্যকে পড়াবে কি না ?**

(উঃ) বরাবর পড়াতে থাকবে কেননা পড়ার চেয়ে পড়ানোয় বিদ্যার বৃদ্ধি বেশী হয়, নিজে পড়ে নিজে একা বিদ্বান হওয়া যায় কিন্তু পড়ালে অন্যও হয়ে যায়, উত্তরোত্তর বিদ্যার বৃদ্ধি হতে থাকে। যারা বিদ্যা লাভ করে সেই মনুষ্য পরোপকারী, ধার্মিক অবশ্যই হয়। কেননা যেমন অন্ধ কুঁয়ায় পড়ে যায় কিন্তু চক্ষুষ্মান কখনো পড়েনা। অবিদ্যার হানি হওয়া ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ালে সিদ্ধ হয়।

(প্রঃ) ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলল – সকলেই যদি বিদ্বান্ হয়ে যাবে তাহলে আমাদেরকে কে জিজ্ঞাসা করবে ? নিজে নিজেই সব পুস্তক দেখে অর্থ বুঝে নেবে, পূজা-পাঠে ডাকবে না। বিশেষ বিঘ্ন হতে পারে ধনাঢ্য ও রাজাদের পড়ানোয়, কেননা তাদের জন্য আমাদের জীবিকা চলে। কোনো শূদ্র যখন তার কাছে পড়ার ইচ্ছায় গিয়ে বলে – আমাকে আপনি কিছু পড়ান।

অল্পবুদ্ধি – তুই কে ? কী কাজ করিস ? এবং তোদের ঘরে কী রকম ব্যবহার হয় ?

(উঃ) আমি তো মহারাজ আপনার দাস শূদ্র কিছু কৃষি কাজ হয় এবং ঘরে কিছু টাকা – পয়সা খাটাই।

নষ্টমতি – ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তোর শোনার এবং আমাদের শোনানোর অধিকার নেই, তুই যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্ম করবি তাহলে নরকে যাবি কিনা ? তবে হ্যাঁ, তোর বেদ থেকে ভিন্ন গ্রন্থের আখ্যান শোনার অধিকার আছে। যখন তোর শোনার ইচ্ছা হবে তখন আমাকে ডেকে নিবি, শুনিয়ে দেব কিন্তু নিজে নিজেই আখ্যান পড়বি না, তাতে অধর্ম হবে। যা কিছু উপহার, দক্ষিণা এনেছিস, রেখে চলে যা এবং শোন্, আমার বচন মেনে নিবি নতুবা তোর মুক্তি কখনও হবে না। খুব আয়-উপার্জন কর এবং আমাদের সেবা করতে থাকিস। এর মধ্যে তোর কল্যাণ নিহিত এবং তোর উপর ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন।

দাস – মহারাজ ! আমার পড়ার ইচ্ছা খুব । বিদ্যা পড়া কি খারাপ জিনিস যে দোষ লেগে যাবে ?

বকবৃত্তি – থাম্-থাম্, তোর মন কেউ পাল্টে দিয়েছে, সে জন্য আমাদের সামনে উত্তর - প্রত্যুত্তর করছিস ? হায়! কী করবো, কলিযুগ এসে গেছে । বিদ্যা পড়ে আমাদের উপদেশ মানে না, নষ্ট হয়ে গেছে ।

দাস – তবে কি কলিযুগ আমাদের উপর আক্রমণ করে দিয়েছে যে আমাদেরকে পড়তে এবং মুক্তি পেতে বাধা দিচ্ছেন ?

স্বার্থী – হ্যাঁ - হ্যাঁ, সত্যযুগ হলে তুই আমাদের সমকক্ষ হতে পারতিস ?

দাস – আচ্ছা, মহারাজ ! আপনি না পড়াবেন আমি তার কাছে যাই যে আমাকে পড়াবে । আমি তার শিষ্য হয়ে যাবো ।

অন্ধকারী – শোন্-শোন্, কলিযুগে আর কী হবে ?

দাস – আপনার সেবা করলে তার প্রতিদানে আপনি আমাদের কী দেবেন ?

মার্জারলিঙ্গী — আশীর্বাদ ।

দাস – সেই আশীর্বাদে কী হবে ?

ধূর্ত – তোদের কল্যাণ ।

দাস – যখন আপনি আমাদের কল্যান চান তাহলে বিদ্যা পড়লে কি অকল্যাণ হয় ?

পোপ উবাচ – এখন কি তুই আমার সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করবি ?

(প্রঃ) **পোপের অর্থ কী ?**

(উঃ) এই শব্দ অন্য দেশের ভাষা থেকে এসেছে । সেখানে এর অর্থ পিতা ও গুরুজন কিন্তু এখানে যে কেবল ধূর্ততা করে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে তার নাম পোপ ।

(প্রঃ) **যে বিদ্যা পড়া হয়েছে এবং যার মধ্যে ধার্মিকতা না থাকে তাহলে তার বিদ্যার ফল হবে কি না ?**

(উঃ) কখনও নয় কেননা বিদ্যার ফল এই যে, মনুষ্যকে অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে । যে বিদ্যার আলোকে ভালো জেনে করেনি এবং খারাপ

জেনে ছাড়েনি সে কি চোরের সমান নয় ? কেননা যেমন চোর চুরিকে খারাপ জেনেও করে এবং সাহুকারী (কুশল ব্যবসায়ী) ভাল জেনেও করে না সেইরকম পড়েও যে অধর্মকে ছাড়ে না এবং ধর্মকে পালন করে না সে কেমন মনুষ্য ?

(প্রঃ) **যখন কোনো মনুষ্য মন থেকে খারাপ জেনেও কোনো বিশেষ ভয়াদির নিমিত্ত ছাড়তে পারে না এবং যদি ভালো কাজ করতে পারে না তখনও কি তার কোনো দোষ বা গুন হয় কি হয় না ?**

(উঃ) দোষই হয় কেননা সে অধর্ম করলে তার ফল অবশ্যই হবে এবং জেনেও ধর্মকে করে না তার সুখরূপ ফল কিছুই হবে না । যদি কোন মনুষ্য কুঁয়াতে পতিত হওয়া খারাপ জেনেও পতিত হয়, তার কি দুঃখ হবে না এবং যদি ভালো রাস্তা জেনেও চলে না তার সুখ কখনও হবে না । এই জন্য –

যথা মতিস্তথোক্তির্যথোক্তিস্তথা কৃতিঃ সৎ পুরুষস্য লক্ষণমতো বিপরীতমসৎ পুরুষস্যোতি । ।

সৎ পুরুষের লক্ষণ এই যে, যেমন আত্মার জ্ঞান, সেইরূপ বচন এবং যেমন বচন সেইরূপ কর্ম করা । এবং যার আত্মা থেকে মন, তার বচন ও বচন থেকে বিরুদ্ধ কর্ম করা সেটা অসৎ পুরুষের লক্ষণ, এইজন্য মনুষ্যের উচিত যে সর্বপ্রকার পুরুষার্থ করে অবশ্য ধার্মিক হওয়া ।

(প্রঃ) **পুরুষার্থ কাকে বলে তার কত ভেদ ?**

(উঃ) অধ্যবসায়ের নাম পুরুষার্থ এবং তার চারটি ভেদ । এক – অপ্রাপ্তির ইচ্ছা, দুই – প্রাপ্তির যথাযথ রক্ষা করা, তিন – রক্ষিতের বৃদ্ধি এবং চতুর্থ – বৃদ্ধি প্রাপ্ত পদার্থের ধর্মে খরচ করা, পুরুষার্থের এইগুলি ভেদ, যা ন্যায় ধর্ম সহ যুক্ত ক্রিয়া থেকে অপ্রাপ্ত পদার্থের অভিলাষ করে পরিশ্রম করা । সেই প্রকার তাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করা যাবে সে পদার্থ কোনো প্রকার নষ্ট ভ্রষ্ট না হয়ে যায় । তাকে ধর্মযুক্ত ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত পদার্থকে উত্তম ব্যবহারে ব্যয় করা, এই চারটি বেদ ।

(প্রঃ) **কী প্রকারে কোনো ব্যবহারে তনু, মন, ধন লাগানো উচিত ?**

(উঃ) **নিম্নলিখিত চারপ্রকারে –** বিদ্যার বৃদ্ধি, পরোপকার, অনাথ-পালন এবং নিজ আত্মীয়দের রক্ষা বিদ্যার জন্য শরীর আরোগ্য এবং তার দ্বারা যথাযোগ্য ক্রিয়া করা, মনে অত্যন্ত বিচার করা বা করানো এবং ধন দ্বারা নিজ সন্তান ও অন্য মনুষ্যকে বিদ্যাদান করা করানো উচিত। পরোপকারের জন্য – শরীর ও মন দ্বারা অত্যন্ত অধ্যবসায় এবং ধন দ্বারা নানা প্রকারের। ব্যবহার তথা কারখানা দাঁড় করবেনা যাতে অনেক মনুষ্য কর্ম করে নিজ নিজ জীবন সুখপূর্বক ব্যতীত করতে পারে। অনাথ তাকে বলে যে নিজের পালন সামর্থ্য দ্বারা করতে পারে না যেমন – বালক, বৃদ্ধ, রুগী, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। তাদেরকেও তনু, মন, ধন লাগিয়ে সুখী রেখে যাকে দিয়ে যে কাজ হয় সেই কাজ সিদ্ধ করা উচিত যাতে কেউ অলস হয়ে নষ্টহদ্ধি না হয়। নিজ সন্তানাদি মনুষ্যের আহার্য্য দ্রব্যাদি এবং বিদ্যা প্রাপ্তি হেতু যত তনু, মন, ধন লাগানো হয় সেটা অল্পই বলতে হবে। কিন্তু কাউকে কখনও নিষ্কর্মা থাকা বা রাখা উচিত নয়।

(প্রঃ) **বিবাহ করে স্ত্রী পুরুষ পারস্পরিক কেমন ব্যবহার করবে ?**

(উঃ) কখনও কেউ অপ্রিয়াচরণ অর্থাৎ যে ব্যবহারে একে অন্যের কষ্ট হয়, সে রকম কাজ কখনও করবে না – যেমন ব্যভিচারাদি। একে অন্যকে দেখে প্রসন্ন হবে, একে অপরের সেবা করবে। পুরুষ ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রিয়বচনাদি ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীকে সর্বদা প্রসন্ন রাখবে এবং ঘরের সব কাজ তার অধীন করবে। স্ত্রী নিজ পতিকে প্রসন্ন বদন, পান-ভোজনাদি ও প্রেমভাব ইত্যাদি দ্বারা সর্বদা তাকে খুশী রাখবে যাতে উত্তম সন্তান হয় এবং সর্বদা উভয়ের মধ্যে আনন্দ বৃদ্ধি হতে থাকে।

(প্রঃ) **এমন না করলে কী ক্ষতি ?**

(উঃ) সর্বস্বনাশ, কেননা পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনা গৃহাশ্রমে না কিঞ্চিৎ সুখ, না উত্তম সন্তান এবং না প্রতিষ্ঠা বা লক্ষ্মী ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পদার্থের প্রাপ্তি কখনও হয়। শোন ! মনু মহারাজ কী বলছেন –

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।

মনু অ০ ৩।৬০।।

অর্থ – যে কুলে স্ত্রীর প্রতি পুরুষ এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রী আনন্দিত থাকে, তন্মধ্যে নিশ্চিত কল্যাণ নিহিত। কিন্তু এ কখন হবে যখন ব্রহ্মচর্য দ্বারা বিদ্যা গ্রহণ করে যুবাবস্থায় পরস্পর পরীক্ষা করে প্রসন্নতাপূর্বক স্বয়ংবর বিবাহ করবে। কেননা যত সুখের ক্ষতি বিদ্যা ও উত্তম প্রজার ক্ষতি বাল্যাবস্থায় বিবাহ থেকে হয়। তত সুখলাভ ব্রহ্মচর্য দ্বারা শরীর ও আত্মার পূর্ণ যুবাবস্থায় পরস্পর প্রীতিপূর্বক বিবাহ করলে হয়। যে মনুষ্য পরস্পর প্রীতিপূর্বক স্বয়ংবর বিবাহ করে সন্তান উৎপন্ন করে তাদের সন্তানও এমন যোগ্য হয় যে. লাখের মধ্যে একটাই হয়ে থাকে। যার মধ্যে বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ধর্ম ও সুশীলাদি শুভগুন পূর্ণ হয়ে মহাভাগ্যশালী অভিহিত হয়ে নিজের কুলের গর্বের কারণ হয়ে থাকে।

(প্রঃ) **মনুষ্যত্ব কাকে বলে** ?

(উঃ) এই মনুষ্য জাতির মধ্যে এমন একটা গুণ যা অন্য কোনো জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

(প্রঃ) **সেটা কী** ?

(উঃ) মনুষ্যেতর যত ভিন্ন প্রাণী আছে তার মধ্যে দুই প্রকার স্বভাব দেখতে পাওয়া যায় বলবানকে ভয় করা, দুর্বলকে ভীত করা এবং পীড়া দেওয়া অর্থাৎ অন্যের প্রাণহরণ করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করা। যে মনুষ্যের এই রকম স্বভাব তাকেও এই সব জাতি মধ্যে গননা করা উচিত। দুর্বলের প্রতি দয়া, তার উপকার এবং দুর্বলকে পীড়াদানকারী অধর্মী বলবানকে কিঞ্চিন্মাত্র ভয়, শংকা না করে তাকে পরপীড়া থেকে সরিয়ে দুর্বলের রক্ষা, তনু, মন, ধন দ্বারা সর্বদা এরকম করা, এটাই মনুষ্য জাতির নিজস্ব গুণ। কেননা যে মন্দ কাজ করতে ভয় এবং সত্য কাজ করতে কিঞ্চিৎ ও ভয়, শংকা করে না সে মনুষ্য ধন্যবাদের পাত্র।

(প্রঃ) দেখুন মশাই! সব সময় সত্য দিয়ে কোনো ব্যবহার সিদ্ধ হতে পারে না। ব্যবসায় সত্য কথা বলে দিলে কোন পদার্থ বিক্রী করা যাবে না, (মামলায়) হার জিতের ব্যবহারে মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় না করালে হার হয়ে যাবে। এই সব কারণে সব জায়গায় সত্যভাষনাদি কেমন করে করতে পারি ?

(উঃ) এটা মহামূর্খতার কথা। যেমন কোনো গ্রামে এক লালবুঝক্কড়

থাকত যাকে পাঁচ শত গ্রামবাসীরা মহাপন্ডিত ও একই গুরু মানত। এক রাতে কোনো রাজার হাতি সেই গ্রামের নিকট দিয়ে কোথাও চলে গিয়েছিল, তার পায়ের চিহ্ন যেখানে সেখানে পড়েছিল। তা দেখে কৃষক গ্রামবাসী পরস্পর বলাবলি করে – হে ভাই, এ কিসের ছাপ ? সবাই বলল – আমরা জানি না, তখন সকলের সম্মতি নিয়ে লালবুঝক্কড়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমাকে ছাড়া কোনো মনুষ্য এর সমাধান করতে পারবে না। বলো, এটা কার পায়ের ছাপ ? তখন সে একবার কাঁদলো, পরে হাসলো। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে – তুমি কাঁদলে কেন এবং হাসলেই বা কেন ? তখন সে বলল – কাঁদলাম এই জন্য যে, আমার মরার পর এই সব কথাগুলির উত্তর কে দিবে এবং হাঁসলাম এইজন্য যে, এর উত্তর তো খুব সোজা। শোন –

লালবুঝক্কড় বোঝে আর কেউ না পারে বুঝতে।
পায়ে চাকা বেঁধে হরিণ গেছে লাফাতে লাফাতে।।

জঙ্গলে হরিণ থাকে। সে কোন বুনো মানুষের চাকির পাটা নিজের পায়ের সঙ্গে বেঁধে লাফাতে লাফাতে গেছে। সবাই শুনে 'বাঃ বাঃ' বলে তাকে ধন্যবাদ দেয় যে, তোমার মতো পৃথিবীতে কোনো পন্ডিত নেই যে এর উত্তর দিতে পারে। যখন লালবুঝক্কড় গ্রামের দিকে আসছিল সেই সময় একজন গ্রামীন স্ত্রী জঙ্গল থেকে কুল এনে, তার যে ছেলে চালের থাম ধরে দাঁড়িয়েছিল, তাকে বলে – নে কুল খা। সেও হাতের অঞ্জলি করে কুল নিল। কিন্তু থাম ধরে থাকার ফলে যখন তার হাত মুখ পর্যন্ত পৌঁছাল না, তখন ছেলে কাঁদতে শুরু করল। তাকে কাঁদতে দেখে তার মা ও বাপও কাঁদতে থাকে যে, হায়! আমার ছেলেকে থাম ধরে ফেলেছে। এখন কী হবে ? এই শুনে আশে পাশের প্রতিবেশী কাঁদতে থাকে যে, ওরে বাবা ! এই ছেলেকে থাম এমন ধরে ফেলেছে যে, ছাড়ছেই না। তখন কেউ পরামর্শ দিল যে, লালবুঝক্কড়কে ডাকো। তাকে ছাড়া কেউ ছেলেকে ছাড়াতে পারবে না। তখন একজন মনুষ্য শীঘ্র তাকে ডেকে আনলো। তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো – এই ছেলেটি কীভাবে ছাড়া পাবে। তখন সে বলল – শোন তোমরা দুই প্রকারে এই ছেলে ছাড়া পেতে পারে। প্রথমতঃ কুড়ুল এনে ছেলের এক হাত কেটে ফেলাও, এখনই

ছাড়া পাবে। দ্বিতীয় উপায় হলো প্রথমে চালটাকে উপরে উঠিয়ে নীচে রাখো। ছেলেকে থামের ওপর থেকে নীচে নামাও। ছেলের বাবা বলল – আমরা দরিদ্র মানুষ, আমাদের চাল ভেঙে গেলে ছাওয়া কঠিন হবে। তখন লালবুঝক্কড় বলল – আনো কুড়ল। আবার কী দেখছ ? কুড়ুল এনে যখন হাত কাটতে উদ্যত হয় তখন অন্য গ্রাম থেকে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীও হৈ চৈ শুনে এসে গেল। সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল – হাত কেটো না, আমি এই ছেলেকে ছাড়াচ্ছি। সে থামের কাছে গিয়ে ছেলের অঞ্জলির নীচে নিজের অঞ্জলি করে বলল – ছেলে ! আমার হাতে কুল দিয়ে দাও। সে কুল ছেড়ে আলাদা হলো তখন তাকে কুল দিলো। তখন লালবুঝক্কড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল – এ ছেলেটা ছয় মাসের মধ্যে মারা যাবে, কেননা যেমন আমি বলেছিলাম সেইরকম করলে মরতো না। তখন তার মা বাপ ব্যাকুল হয়ে বলল – এখন কী করা উচিত ? সেই স্ত্রী তাদেরকে বোঝালো যে একথা মিথ্যা এবং হাত কাটলে এ এখনই মারা যেত তখন তোমরা কী করতে ? মরার থেকে বাঁচার কোন ওষুধ নেই। তখন তাদের ব্যাকুলতা দূর হলো।

যে মনুষ্য মহামূর্খ, সে এইরকম চিন্তাকরে যে সত্যথেকে ব্যবহারে নাশ ও মিথ্যা থেকে ব্যবহারের সিদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কারও কোন এক ব্যবহারে মিথ্যা ধরা পড়ে তখন তার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বাস সব নষ্ট হয়ে তার সব ব্যবহার নষ্ট হয়ে যায় এবং যে সব ব্যবহারে মিথ্যা ছেড়ে সত্যই বলে থাকেন তার লাভই লাভ, ক্ষতি কখনও হয় না, কেননা সত্য ব্যবহার করার নাম ধর্ম এবং তদ্বিপরীত অধর্ম। ধর্মের সুখ কি লাভরূপী এবং অধর্মের দুঃখরূপী ফল হয় না ? প্রমাণ –

ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।।১।। যজু০ অ০১।ম০৫।।

সত্যমেব জয়তি নাऽনৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্।।২।। মুন্ডক৩।খ০১।ম০৬।।

ন সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।।৩।। ইত্যাদি

অর্থ – মনুষ্য মধ্যে মনুষ্যত্ব এই যে, সব সময় মিথ্যা ব্যবহার ত্যাগ

করে সত্য ব্যবহারকে সর্বদা গ্রহণ করবে। ।১। । কেননা সর্বদা সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয় হয়ে থাকে। এইজন্য যে সত্যের জন্য ধার্মিক ঋষির সত্যের নিধি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এখনও হচ্ছেন, তার সেবন মনুষ্য কেন করবে না। ।২। । এ নিশ্চিত যে সত্যের উপরে কোন ধর্ম নেই এবং অসত্যের উপরে কোন অধর্ম নেই। ।৩। সেইজন্য সেই সব লোকেরা ধন্য যারা সব ব্যবহারে সত্যই করে থাকেন এবং মিথ্যাযুক্ত কর্ম কিঞ্চিন্মাত্রও করেন না।

দৃষ্টান্ত ঃ- কোন একজন অধার্মিক মানুষ কোন অধার্মিক বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে বলল, আমাকে কাপড়ের গজ দেবে ? সে বলল ষোল আনা দেবো, তুমি কিছু বলো। বস্ত্র ব্যবসায়ী ও গ্রাহক উভয়েই জানেন যে, এ দশ আনা দামের গজ কাপড় কিন্তু অধর্মী মিথ্যা বলতে ছাড়ে না। (গ্রাহক) ছয় আনা গজ দাও এবং দেওয়ার মতো কথা বলো।

(বস্ত্র ব্যবসায়ী) আচ্ছা, তোমাকে দুই আনা ছাড়ছি, চোদ্দ আনা দাও।

(গ্রাহক) বেশী হচ্ছে। সাত আনা নিয়ে নাও।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা, সত্য সত্যই বলব ?

(গ্রাহক) হ্যাঁ।

(বস্ত্র বিক্রেতা) ঠিক আছে এক আনা ছাড়ছি। তের আনা দাও। নেবার হলে নাও।

(গ্রাহক) আমি সত্য বলছি যে, এর আট আনার বেশী কেউ তোমাকে দাম দেবে না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তোমাকে নিতে হয় নাও, না নেবার হয় নিও না। পরমাত্মার দিব্যি, বারো আনা গজ আমারই পড়েছে। তোমাকে ভালো মানুষ জেনে দিচ্ছি।

(গ্রাহক) ধর্মের দিব্যি, আমি সত্য বলছি তোমার দেওয়ার হলে দাও নতুবা অনুতাপ হবে। আমি অন্য দোকান থেকে নিয়ে নেব। একটাই কি তোমার দোকান ? নয় আনা গজ দিয়ে দাও, নতুবা আমি চললাম।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তুমি এমন কখনও কিনেছ। নয় আনা গজ দিলে আমি একশ' টাকার নেব।

গ্রাহক ধীরে ধীরে চলে যায় আর ভাবে আমাকে আবার ডাকে

কিনা। বস্ত্র বিক্রেতা তির্যক দৃষ্টি দিয়ে দেখে যে সে ফিরে আসে কিনা। যখন সে ফিরল না, তখন বলল–শোন এদিকে এস।

(গ্রাহক) কী বলছ, নয় আনায় দেবে ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) এই নাও ধর্মের নামে লছি এগারো আনা দাও।

(গ্রাহক) সাড়ে নয় আনা দেব। এই বলে কিছু এগিয়ে গেল। বস্ত্র বিক্রেতা দেখল হতে থেকে ক্রেতা ফসকে যায়, তাই তাকে আবার ডাকে।

(বস্ত্র বিক্রেতা) শোন, শোন এদিকে এসো।

(গ্রাহক) কেন দেরী করছ ব্যর্থ সময় নষ্ট হচ্ছে।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আমার ছেলের নামে দিব্যি, তুমি যদি না নাও, পশ্চাতাপ করবে। এখন আমি সত্যই বলছি সাড়ে দশ দিয়ে দাও, নতুবা তোমার যেমন খুশী।

(গ্রাহক) আমার দিব্যি তুমি দুই আনা বেশী নিয়েছ। আচ্ছা দশ আনা দিচ্ছি। এ দাম এই তো।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা, সওয়া দশ আনা তো দেবে ?

(গ্রাহক) না - না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা, এসো বসো। কয় গজ নেবে ?

(গ্রাহক) সওয়া গজ।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আরে, একটি বেশী নাও।

(গ্রাহক) আচ্ছা, নমুনা নিয়ে যাচ্ছি শুধু। এখন তোমার দোকান দেখে নিলাম, পরে আসব, তখন অনেক নেব।

বস্ত্র ব্যবসায়ী মাপে কিছু গন্ডগোল করে।

(গ্রাহক) দেখি তো। তুমি কেমন মেপেছ ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) বিশ্বাস করছ না আমরা সাহুকার না তামাশা ? আমরা কখনও মিথ্যা বলি না করি ?

(গ্রাহক) হ্যাঁ তুমি সত্যবাদী হরিশচন্দ্র। এক টাকা বলে দশ আনায় নেমেছ, ছয় আনা কমিয়েছ, অনেক দিব্যি গিলেছ ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) বাঃ বাঃ। তুমিও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

ছয় আনা বলে দশ আনা পর্যন্ত দিতে তৈরী হয়েছে অনেক দিব্যি গিলে গিলে আসছ, সওদা মিথ্যা ছাড়া কখনও হয় না।

(গ্রাহক) তুই তো বড়ই মিথ্যাবাদী।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তুই ও তো। কেননা এক গজ কাপড়ের জন্য কোন ভালো মানুষ এত ঝগড়া করে ?

(গ্রাহক) তুই মিথ্যুক তোর বাবা মিথ্যুক। আমাদের সাত পুরুষেও কেউ মিথ্যুক হয়নি।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তুই মিথ্যুক তোর সাত পুরুষও মিথ্যুক গ্রাহক জুতো নিয়ে মেরে বসল। বস্ত্র বিক্রেতাও গজ দিয়ে মারে। আশে পাশের দোকানদাররা যেমন তেমন করে থামায়। (বস্ত্রবিক্রেতা) যা-যা, তোর মতো লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছি।

(গ্রাহক) যা-যা, তোর মতো জুয়াচোর, গলাকাটা দোকানদার আমি কোটি কোটি দেখেছি।

(আশে পাশের লোক) আরে মশাই, মিথ্যা ছাড়া কখনও সওদা হয় ? যাও, তুমি তোমার দোকানে বসো আর তুমি যাও তোমার বাড়ি।

(বস্ত্র বিক্রেতা) এই মানুষটি অত্যন্ত দুষ্ট।

(গ্রাহক) এই মুখ সামলে কথা বল্।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তুই কী করবি ?

(গ্রাহক) যা আমি করেছি তাতো দেখতে পেলি, আরও কিছু দেখার হয় তো দেখিয়ে দি ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) গজ দিয়ে পিটুনি খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে ? উভয়ে লড়াই করতে দৌড়ায়, লোকেরা ছাড়ায়, এই রকম সর্বত্র মিথ্যা লোকদের দুর্দশা হয়।

ধার্মিকের দৃষ্টান্ত –

(গ্রাহক) এই শালের কী দাম ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) পাঁচ শ টাকা।

(গ্রাহক) আচ্ছা নিন।

(বস্ত্র বিক্রেতা) শাল নিন।

সত্য দোকানদারের কাছে কোনো মিথ্যা গ্রাহক যায়। জিজ্ঞাসা করে – এই শালের কী দাম নিবেন ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) আড়াই শ টাকা।

(গ্রাহক) দুই শ নিন।

(সেঠ) যাও এখানে তোমার কোনো সওদা হবে না।

(গ্রাহক) ওহো, কিছু তো কম করবেন ?

(সাহূকার) এখানে মিথ্যার ব্যবহার হয় না, বেশী বলবেন না, নিতে হয় নিন নতুবা চলে যান। গ্রাহক অন্যান্য অনেক দোকানে গিয়ে দরাদরি করে পুনরায় সেখানে এসে আড়াই শ টাকা দিয়ে শাল নিয়ে গেল। সত্য গ্রাহক মিথ্যা দোকানদারের কাছে গিয়ে বলল এই পীতাম্বরের দাম কত ?

(বস্ত্র বিক্রেতা) পঁচিশ টাকা।

(গ্রাহক) বারো টাকায় দিতে হয় দাও। এই বলে হাঁটতে শুরু করে।

(বস্ত্র বিক্রেতা) কী হলো, আঠার তো দেবেন ?

(গ্রাহক) না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা চোদ্দ ?

(গ্রাহক) না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) তেরো ?

(গ্রাহক) না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা, সাড়ে বারোই দিন।

(গ্রাহক) না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) সওয়া বারো ?

(গ্রাহক) না।

(বস্ত্র বিক্রেতা) আচ্ছা, বারোই হোক।

(গ্রাহক) আনুন। নিন টাকা।

এমন ধার্মিকদের সর্বদা লাভই লাভ হয় এবং মিথ্যার দুর্দশা হয়ে সর্বস্বান্ত হয়, এই জন্য সব মনুষ্যের উচিত যে, সব সময় মিথ্যা পরিত্যাগ করে সত্যেরই ব্যবহার করবে। যার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা আনন্দে থাকে।

(প্রঃ) মনুষ্যের আত্মা সর্বদা ধর্ম ও অধর্মযুক্ত কোন-কোন কর্ম দ্বারা হয় ?

(উঃ) যতক্ষণ মনুষ্য সর্বান্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বব্যাপক, সর্বকর্মের সাক্ষী পরমাত্মাকে ভয় করে না অর্থাৎ কোনো কর্ম এমন নয় যাকে সে জানেনা,

সত্যবিদ্যা, সুশিক্ষা সৎ পুরুষদের সঙ্গ, শ্রমশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ব্রহ্মচর্যাদি শুভ গুন হওয়ার এবং লাভ অনুযায়ী ব্যয় করায় ধর্মাত্মা হয় এবং যে এর বিপরীত হয়, সে ধর্মাত্মা কখনও হতে পারে না, কেননা যে রাজা ইত্যাদি অল্পজ্ঞ মনুষ্যকে ভয় করে এবং পরমেশ্বরকে ভয় করে না সে কী করে ধর্মাত্মা হতে পারে ? কেননা রাজাদির সামনে বাইরের অধর্মযুক্ত চেষ্টা করায় ভয় হয় কিন্তু আত্মা ও মনে মন্দ চেষ্টা করায় কিছুমাত্র ভয় হয় না কেননা তারা ভিতরের কর্ম জানতে পারে না, এই জন্য আত্মা ও মনের নিয়ামক রাজা এক আত্মা ও দ্বিতীয় পরমেশ্বর, মনুষ্য নয়। এবং তারা যেখানে একান্তে, রাজাদি মনুষ্যকে দেখে না সেখানে, বাইরে থেকেও চুরি ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম করায় কিছুমাত্র শংকা করে না।

দৃষ্টান্ত – এক ধার্মিক বিদ্বানের কাছে পড়ার জন্য দুইজন নবীন বিদ্যার্থী এসে বলল – আপনি আমাকে পড়ান। (বিদ্বান) আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়াব কিন্তু আমি বলছি একটা কাজের কথা, তোমরা দুই জনে করে এসো। এই এক একটা ছেলেকে একান্তে নিয়ে গিয়ে যেখানে কেউ দেখে না, সেখানে এর কান ধরে দুই চার বার শীঘ্র ওঠ-বস করিয়ে ধীরে একটা চাপড় মেরে দেবে। দুই জনে দুটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। একজন চারদিকে দেখল, এখানে কেউ দেখে না, উক্ত কাজ করে তাড়াতাড়ি সে চলে আসে। দ্বিতীয় পন্ডিতের বচনের অভিপ্রায় বিচার করতে লাগল – এই ছেলেটা আমাকে এবং আমি ছেলেটাকে তো দেখছি তাহলে কাজ কী করে করা সম্ভব ? পন্ডিতের কাছে চলে আসে। তখন যে প্রথমে এসেছিল তাকে পন্ডিত জিজ্ঞাসা করল – আমি যা বলেছিলাম, তুমি করে এসেছ ? সে বলল – হ্যাঁ, দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করে – তুমিও করে এসেছ মনে হয়। সে বলল না, কেননা আপনি আমাকে বলেছিলেন যেখানে কেউ না দেখে, সেখানে কাজ করবে। সেরকম জায়গা আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি এই ছেলেকে এবং ছেলেটা আমাকে দেখছে। পন্ডিত বলল – তুমি বুদ্ধিমান ও ধার্মিক, আমার কাছে পড়ো, দ্বিতীয়কে বলল – তুমি পড়ার যোগ্য নও, চলে যাও। কোনো স্থান বা কর্ম কি এমন আছে যাকে আত্মা ও পরমাত্মা না দেখে। যে মনুষ্য এই

প্রকার আত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষ্যর অনুকূল কর্ম করে তাদেরকেই ধর্মাত্মা বলে।

(প্রঃ) সব মনুষ্যের পক্ষে বিদ্বান ও ধর্মাত্মা হওয়া সম্ভব কি না ?

(উঃ) বিদ্বান হওয়া তো সম্ভব নয় কিন্তু ধর্মাত্মা হতে চাইলে সকলে হতে পারে। অবিদ্বান ব্যক্তিরা অন্যকে ধর্মে নিশ্চয় করাতে পারে না এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা ধার্মিক হয়ে অনেক মনুষ্যকেও ধার্মিক করতে পারে এবং কোনো ধূর্ত মনুষ্য অবিদ্বানকে প্রলোভিত করে অধর্মে প্রবৃত্ত করাতে পারে। কিন্তু বিদ্বান অধর্মে কখনও চলতে পারে না কেননা যেমন দেখে কোন মনুষ্য কূঁয়ায় কখনও পড়ে না কিন্তু অন্ধের পড়ার সম্ভাবনা বেশী, সেইরূপ বিদ্বান সত্যাসত্য জেনে তাতে নিশ্চিত থাকতে পারে কিন্তু অবিদ্বান্ সঠিক স্থির থাকতে পারে না।

দৃষ্টান্ত – যেমন কোনো অবিদ্বান রাজা ছিল। তার রাজ্যে কোনো গ্রামে কোনো মূর্খ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করতো। তার স্ত্রী বলল – আজকাল ভোজনও পাওয়া যায় না, অত্যন্ত কষ্ট, তুমি প্রথমে দানাধ্যক্ষের কাছে যাবে, সে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে জপ-অনুষ্ঠানে লাগিয়ে দেবে। ব্রাহ্মণ সেইরকমই করে। যখন সে দানাধ্যক্ষের নিকটে গিয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলল – আপনি আমার কোন জীবিকা করে দিন। (দানাধ্যক্ষ) আমাকে, কী দেবে ? (প্রার্থী) যা তুমি বলো। (দানাধ্যক্ষ) অর্দ্ধমর্দ্ধং স্বাহা। (প্রার্থী) মহারাজ, আমি বুঝতে পারলাম না তুমি কী বল্লে ? (দানাধ্যক্ষ) আমাকে অর্ধেক দেবে এবং অর্ধেক তুমি নিয়ে জীবিকা চালাবে। এমন যদি হয় তবে তোমার জীবিকা লাগাতে পারি। (স্বার্থী) যেমন তোমার ইচ্ছা তেমন করো। (দানাধ্যক্ষ) আচ্ছা চল রাজার কাছে। (স্বার্থী) চলো। তোষামোদ কারীতে সভা ভরা ছিল, সেখানে উভয় উপস্থিত হলো। দানাধ্যক্ষ বলল – এ গোব্রাহ্মণ। এর কোনো জীবিকা করে দিন। এ আপনার জপ, অনুষ্ঠান করে দেবে। (রাজা) আচ্ছা, আপনি যেমন বলবেন। (দানাধ্যক্ষ) দশ টাকা মাসিক হওয়া দরকার। (রাজা) খুব ভালো। (দানাধ্যক্ষ) ছয় মাসের মাহিনা প্রথমে পাওয়া দরকার, (রাজা) আচ্ছা কোষাধ্যক্ষ, একে ছয় মাসের টাকা যোগ করে দিয়ে দাও। (কোষাধ্যক্ষ) যে

আজ্ঞা। যখন স্বার্থী টাকা নিতে গেল তখন কোষাধ্যক্ষ বলে – আমাকে কী দেবে ? (স্বার্থী) আপনিও এক-দুই নিয়ে নেবেন। (কোষাধ্যক্ষ) ছিঃ ছিঃ দশের কম আমি নেব না। নয়তো আজ টাকা পাওয়া যাবে না। কালকে আসবে। ততক্ষণ দানাধ্যক্ষ একটা চাকর পাঠিয়ে দিল যে ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো, কোষাধ্যক্ষ দশ টাকা মেরে দিল। পঞ্চাশ টাকা নিয়ে চলল। রাস্তায় (চাকর) আমাকেও কিছু দাও। (স্বার্থী) আচ্ছা ভাই, তুমিও এক টাকা নিয়ে নাও। যখন দরোজা আসে, সিপাহী আটকায়, কে তুমি ? একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? (চাকর) আমি দানাধ্যক্ষের চাকর। (সিপাহি) এ কে ? (চাকর) জপানুষ্ঠানী (সিপাহী) কিছু পাওয়া গেল ? (চাকর) এই জানে। বল ভাই কী, পেয়েছ ? (স্বার্থী) তোমাদের কাছ থেকে বেচে যত ঘরে পৌঁছায় তাই পেয়েছি। (সিপাহী) আমাকেও কিছু দিয়ে যা। (স্বার্থী) – নাও, আট আনা (সিপাহী) দাও।

ততক্ষণ দানাধ্যক্ষ চিন্তায় পড়ে, সে পালিয়ে গেল না তো ? দ্বিতীয় চাকরকে বল্লো – দেখো তো, সে কোথায় গেল ? ইতিমধ্যে স্বার্থী ইত্যাদি এসে উপস্থিত হলো। (দানাধ্যক্ষ) দাও, টাকা কোথায় ? (স্বার্থী) এই হলো আটচল্লিশ। (দানাধ্যক্ষ) বাঃ বাঃ বারো টাকা কোথায় গেল ? স্বার্থী যেমন ঘটেছে সেইরকম খুলে বলে। (ধানাধ্যক্ষ) আচ্ছা, চার আমার গেছে, আট তোমার। (স্বার্থী) যেমন আপনার ইচ্ছা। তখন ছাব্বিশ দানাধ্যক্ষ নিল এবং বাইশ স্বার্থী নিয়ে বলল – আমি ঘর থেকে আসি, কাল আসব। দ্বিতীয় দিন সে আসল, তাকে দানাধ্যক্ষ বলে – তুমি গঙ্গায় গিয়ে রাজার নাম জপ করো। এই নাও ধুতি, গামছা, পঞ্চপাত্র, মালা ও গোমুখী। তাই নিয়ে গঙ্গায় গেল। সেখানে স্নান করে মালা নিয়ে জপ করতে বসল। মনে মনে ভাবলো দানাধ্যক্ষ যা বলেছে তাই মন্ত্র এইরকম সেই মূর্খ বুঝল। সরপমালা লটক মনকা আমি রাজার জপ করব, আমি রাজার জপ করব জপতে থাকে।

তখন কোনো দ্বিতীয় মূর্খ ভাবে যে ওর হয়ে গিয়েছে তা আমারও হবে। যাক্, হয়ে গেল, সেই রকমই হলো। যাওয়ার সময় দানাধ্যক্ষ বলল – তুমি যাও, সে যেমন করে, তেমন করবে। সে গেল, সেইরূপ আসনের

উপর বসে তার মন্ত্র শুনে জপ করতে থাকে। তুই যেমন করবি, তেমন আমি করব। সেইরূপ তৃতীয় ধূর্ত গিয়ে সব কিছু করিয়ে আনে। যাওয়ার সময় দানাধ্যক্ষ বলে যতক্ষণ নির্বাহ হয় ততক্ষণ করবে। সেও এই অভিপ্রায়কে মন্ত্র ভেবে সেখানে গিয়ে জপ করতে বসে গেল ও জপ করতে থাকল। ''যতক্ষন নির্বাহ হয়, ততক্ষণ কর। যতক্ষণ নির্বাহ হয়, ততক্ষণ কর।'' এইরূপ চতুর্থ মূর্খ সব ব্যবস্থা করে গঙ্গায় যেতে থাকে, তখন দানাধ্যক্ষ বলে – যতক্ষণ নির্বাহ হয় ততক্ষণ করবে। সেও একে মন্ত্র মেনে গঙ্গাতটে এসে জপ করতে থাকে, সে তিন জনকে জপ করতে শোনে – ''আমি রাজার জপ করব, আমি রাজার জপ করব।'' দ্বিতীয় – ''যেমন তুই করবি তেমন আমি করব।'' তৃতীয় – ''যতক্ষণ নির্বাহ হয়, ততক্ষণ কর'', চতুর্থ যোগ দিল – ''ততক্ষণ নির্বাহ, না হলে ধর। ততক্ষণ নির্বাহ, না হলে ধর।''

মনে রাখবে যে, সব অধর্মী ও স্বার্থী লোকদের লীলা এইরকমই হয়ে থাকে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক অন্যায় রূপ কর্ম করে অন্য মনুষ্যকে প্রতারিত করে। দুর্ভাগ্য সেই সব মনুষ্যের যাদের আত্মা অবিদ্যা ও অধর্মান্ধকারে পড়ে কখনও সুখ প্রাপ্ত হয় না।

এখানে কোনো এক ধার্মিক রাজার দৃষ্টান্ত শোন –

কোন এক বিদ্বান্ ধার্মিক রাজা ছিল। তার দানাধ্যক্ষের কাছে কোনো ধূর্ত গিয়ে বলে – আমার জীবিকা করে দাও। (দানাধ্যক্ষ) তুমি কী কী শাস্ত্র পাঠ করেছ এবং কী কী কাজ করো ? (স্বার্থী) আমি কিছু পড়িনি এবং কুড়ি বৎসর পর্যন্ত খেলা, লাফালাফি করা, মোষ চরিয়ে ক্ষেতে ঘোরা ফেরা করেছি এবং মা বাবার সামনে আনন্দ করেছি। এখন ঘরের সব ভার আমার উপর এসে গেছে, আপনার কাছে এসেছি কিছু করে দিন। (দানাধ্যক্ষ) চাকরী যদি করতে চাও, করে দিতে পারি। (স্বার্থী) আমি ব্রাহ্মণ-সাধু মানুষ, যেখানে-সেখানে বাজারে উপদেশ করি। আমার দ্বারা এইরকম পরিশ্রম কী হতে পারে ? (দানাধ্যক্ষ) তুমি বিদ্যা বিনা ব্রাহ্মণ, পরোপকার বিনা সাধু এবং বিজ্ঞান বিনা উপদেশ-কর্ম কী করে করতে পারো ? এইজন্য চাকরী করতে হয় কর, নতুবা যাও। সেই মূর্খ সেখান

থেকে নিরাশ হয়ে যে, এখানে আমার কথা কেউ শুনবে না, রাজার কাছে গিয়ে বলি। যখন রাজার কাছে গিয়ে সে সেই রূপ বলল তখন রাজা তাকে তেমনই জবাব দিলেন যেমন দানাধ্যক্ষ দিয়েছেন ও রকম করতে হয় কর, নতুবা চলে যাও। সে সেখান থেকে চলে যায়।

এর পর একজন যোগ্য বিদ্বান এসে দানাধ্যক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, দানাধ্যক্ষ বুঝে গেলেন যে, এ অত্যন্ত ভালো সুপাত্র। গিয়ে রাজাকে বললেন – পন্ডিতের সঙ্গে আপনিও কিছু কথাবার্তা বলুন। সেই রকমই করা হলো। তখন রাজা পরীক্ষা করে জানতে পারলেন যে, এ অতি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান। তখন রাজা বলল – আপনাকে হাজার টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হবে। আপনি সর্বদা আমাদের পাঠশালায় বিদ্যার্থীদেরকে পড়াবেন এবং ধর্মোপদেশ দিবেন। সেইরকমই হলো। ধন্য এমন রাজা এবং দানাধ্যক্ষাদি যাদের হৃদয়ে বিদ্যা, পরমাত্মা ও ধর্মরূপ সূর্য প্রকাশিত হয়।

(প্রঃ) **দানাভক্ষ ও দানাধ্যক্ষ কাকে বলে ?**

(উঃ) যে দাতার দান ভক্ষণ করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে থাকে তাকে দানাভক্ষ এবং যে দাতার দান কে সুপাত্র বিদ্বানদেরকে দিয়ে তা দ্বারা বিদ্যা ও ধর্মের উন্নতি করে তাকে দানাধ্যক্ষ বলে।

(প্রঃ) **রাজা কাকে বলে ?**

(উঃ) যে বিদ্যা, ন্যায়, জিতেন্দ্রিয়তা, শোর্য, ধৈর্যাদি গুনে যুক্ত হয়ে স্বীয় পুত্র সমান প্রজাপালনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দিগের রক্ষা ও দুষ্টদের দন্ড দিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি যুক্ত হয়ে নিজের প্রজাকে করিয়ে আনন্দিত থাকে এবং সবাইকে সুখযুক্ত করায়, তাকে রাজা বলা হয়।

(প্রঃ) **প্রজা কাকে বলে ?**

(উঃ) যেমন পুত্রাদি তনু, মন, ধন দিয়ে, নিজের মাতা-পিতাদির সেবা করে তাদেরকে সর্বদা প্রসন্ন রাখে সেইরূপ প্রজা অনেক প্রকারের ধর্মযুক্ত ব্যবহার দ্বারা পদার্থকে সিদ্ধ করে রাজসভাকে কর দিয়ে তাকে সর্বদা প্রসন্ন রাখে তাকে প্রজা বলে। এবং যে নিজের হিত ও প্রজার অহিত করতে চায় সে না রাজা এবং যে নিজের হিত ও রাজার অহিত চায় সে প্রজাও নয় কিন্তু তাদেরকে একে অন্যের শত্রু, ডাকাত, চোর বুঝা উচিত কেননা উভয়ে

ধার্মিক হয়ে এক অন্যের হিত করতে নিত্য প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাদের রাজা ও প্রজা সংজ্ঞা হয়, বিপরীতের নয়, যেমন –

অন্ধের নগরী গবর্গন্ড রাজা। টকে সের ভাজী, টকে সের খাজা।

এক জন বড়ো ধার্মিক বিদ্বান সভাধ্যক্ষ রাজা যথাবৎ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রজাপালনাদি উচিত সময়ে ঠিক ঠিক করতেন। তাঁর নগরীর নাম ছিল প্রকাশবতী, রাজার নাম ছিল ধর্মপাল, ব্যবস্থার নাম – যথাযোগ্য কর্তব্য। তিনি মারা গেলেন। তার পুত্র যে মহা অধর্মী মূর্খ ছিল, সে গদীর উপর বসে সভাকে বলল – যে আমার আজ্ঞা মানবে, সে আমার কাছে থাকুক। যে না মানবে সে বেরিয়ে চলে যাক্ তখন ধার্মিক সভাসদ বললেন – আপনার পিতা সভার সম্মতির অনুকূল আচরণ করতেন। আপনাকে সেই রকম করা উচিত।

রাজা – তার কাজ তার সঙ্গে গিয়েছে এখন আমার যেমন ইচ্ছা হবে, করব। সভা – আপনি সবার কথামত না চললে রাজ্যের নাশ তো হবেই, আপনার নাশ হবে। রাজা – আমার তো যখন হবে দেখা যাবে কিন্তু তোমরা এখান থেকে চলে যাও, নতুবা তোমাদের নাশ এখনই করে দেব। সভাসদগন বলে – '**বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ**।' যার শীঘ্র নাশ হওয়ার তার বুদ্ধি প্রথম থেকেই বিপরীত হয়ে যায়। চলুন, এখানে আমাদের কার্য নির্বাহ হবে না। তারা চলে গেলেন এবং মহামূর্খ ধূর্ত তোষামোদকারীর দল তার সঙ্গ নিল। রাজা বলল – আজ থেকে আমার নাম 'গর্বগন্ড', নগরীর নাম 'অন্ধের নগরী' এবং যা আমার পিতা ও সভা করত, তার সব কাজ আমি উলটো করব। আমার পিতা ও সভাসদ রাতে শুয়ে থাকত এবং দিনে রাজকার্য করত। আমি তার পরিবর্তে দিনে শুয়ে থাকব, রাতে রাজকার্য চালাবো, তার রাজ্যে সব জিনিস নিজ নিজ দরে বিক্রী হতো, আমার রাজ্যে কেশর কস্তুরী থেকে শুরু করে মাটি পর্যন্ত টাকায় একসের বিক্রী হবে।

দেশ দেশান্তরে যখন এইরকম খ্যাত হলো তখন কোনো স্থানে দুই গুরু শিষ্য বৈরাগী আখড়ায় মল্লবিদ্যা করত, পাঁচ পাঁচ সের খেত এবং অত্যন্ত মোটা ছিল। শিষ্য গুরুকে বলল – চলুন, অন্ধের নগরীতে,

সেখানে ১০ (দশ) টাকায় দশ সের মালাই ইত্যাদি মাল খুব পাওয়া যাবে, গুরু বলল গবর্গণ্ড রাজ্যে কখনও যাওয়া উচিত নয় কেননা। কোনো দিন যা খেয়েছি সব বেরিয়ে যাবে। প্রান বাঁচানো কঠিন হবে। কিন্তু শিষ্য জিদ্ করতে লাগল তখন গুরুও মোহবশতঃ সঙ্গে যাত্রা করে, সেখানে গিয়ে অন্ধের নগরীর কাছাকাঠি একটা উদ্যানে বাস করতে থাকে এবং খুব খাওয়া দাওয়া করত এবং কুস্তি করত। এদিকে এক রাতে কোনো সেঠের চাকর এক হাজার টাকার থলে নিয়ে অন্য সেঠের দোকানে জমা করতে চলে যায়। মাঝখানে থেকে কোনো চোর এসে টাকার থলে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়, সিপাহী ধীরে ধীরে গিয়ে কোনো ভাল লোককে ধরে বলল – তুই চোর। সে বলল – আমি অমুক সেঠের চাকর, জিজ্ঞাসা করে দেখ।

(সিপাহী) আমি জিজ্ঞাসা করি না, চল রাজার কাছে, হাজির করে বলল – এই হাজার টাকার থলে চুরি করেছে। গবর্গন্ড এবং তার আশে পাশের লোক কেউ কোন জিজ্ঞাসাবাদ করল না। সে বেচারা চেঁচামেচি করতে থাকে আমি অমুক সেঠের চাকর কিন্তু তার কথা কেউ শোনে না। সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম হলো – একে শূলে দাও। শুল লোহার বল্লমের মত হয়, তার উপর চড়ালে শূল নাভির এপার ওপার হয়ে অবিলম্বে মৃত্যু ঘটে। গবর্গন্ডের চাকরও তার মতো কেন হবে না ? কেননা **'সমানব্যসনেষু মৈত্রী'** যাদের স্বভাব এক সমান হয় তাদের মধ্যে পরস্পর মিত্রতাও হয়। যেমন ধর্মাত্মার সঙ্গে ধর্মাত্মা, পন্ডিতের সঙ্গে পন্ডিতের, দুষ্ট ও ব্যভিচারীদের সেইরকম দুষ্ট ও ব্যাভিচারীদের মিত্রতা হয়। কখনও ধর্মাত্মার সঙ্গে অধর্মাত্মার এবং অধর্মাত্মার সঙ্গে ধর্মাত্মার মিল হয় না।

গবর্গন্ডের সিপাহীরা চিন্তা করে যে, শূল মোটা, মানুষটা দুর্বল, এখন কী করা উচিত ? তখন রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বলা হলো। রাজা সেকথা শূনে হুকুম করলো – একে ছেড়ে দাও, গবর্গন্ডের সিপাহীরা চিন্তা করে শূলের উপযুক্ত মোটা লোক খুঁজতে হবে। তখন কেউ বলে যে, উদ্যানে শূলের মতো মোটা দুই জন গুরু - শিষ্য বৈরাগী আছে। সকলে বলে – ঠিক-ঠিক, গুরু-শিষ্যই বটে। সিপাহীরা তখনই উদ্যানে গিয়ে

শিষ্যকে ধরে বলল – মহারাজের আদেশ, তোমাকে শূলে চড়তে হবে।

শিষ্য কাতর হয়ে বলল – আমি তো কোন অপরাধ করিনি।

সিপাহী – অপরাধ করেননি তা কী হয়েছে কিন্তু শূলের যোগ্য তো বটে। আমরা কী করব ?

সাধু – অন্য কোন লোক নেই ?

সিপাহী – না, বেশী বক-বক করো না, চল, মহারাজের আদেশ।

তখন শিষ্য গুরুকে বলে – মহারাজ, কী করা উচিত ?

গুরু – আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম যে, অন্ধের নগরীতে গবর্গন্ডের রাজ্যে সস্তায় ফল খেতে যেও না, তুমি মানলে না। এখন আমি কী করব ? যেমন হয়, তেমন ভোগ দেখ, এখন সব খাওয়া বেরিয়ে যাবে শিষ্য – এখন কোনো প্রকারে বাঁচান, এখান থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাই, গুরু – একটা বাঁচার যুক্তি আছে। যদি করতে পারো তাহলে সম্ভবতঃ বাঁচতে পারো। শূলে চড়তে গিয়ে তুমি আমাকে সরাবে; আমি তোমাকে সরাবে। এইভাবে পরস্পর ঝগড়া করলে কোনো উপায় বেরিয়ে আসবে, শিষ্য – আচ্ছা, তাই হোক সব কথা অন্য দেশীয় ভাষায় বলা হলো যাতে সিপাহীরা কিছু বুঝতে না পারে। সিপাহী – চলো, দেরী করো না, নতুবা বেঁধে নিয়ে যাবো। সাধুরা বলল – আমরা প্রসন্নতাপূর্বক চলছি, তোমরা কেন বাঁধবে ? সিপাহী – আচ্ছা, চলো। যখন শূলীর নিকট উপস্থিত হলো, তখন দুইজন ল্যাংগোট পরে মাটি লাগিয়ে খুব লড়াই করতে শুরু করে। গুরু বলল – শূলীতে আমি চড়ব, শিষ্য-শিষ্যর ধর্ম নয় যে, আমি থাকতে গুরু শূলে চড়ে। গুরু – আমারও ধর্ম নয় যে, আমার সামনে শিষ্য শূলের উপর চড়ে, তবে, আমাকে মেরেই শূলে চড়াতে পারো। বৃথা বকছো কেন ? চুপ থাকো, সময় চলে যাচ্ছে। এই বলে শূলের উপর চড়তে থাকে। তখন শিষ্য গুরুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। স্বয়ং চড়তে থাকে, তখন গুরুও সেই রকম করলো। গবর্গন্ডের সিপাহীরা এতক্ষণ তামাশা দেখছিল, তারা বলল – তোমরা শূলে যাওয়ার জন্য যুদ্ধ করছো কেন ? তখন দুইজন সাধু বলল – আমাদের কাছে এটা জিজ্ঞাসা করো না। চড়তে দাও। কেননা এমন সময় পাওয়া দুর্লভ।

এটা এখানে এমন হতে থাকে ওদিকে গবর্গণ্ডের আশেপাশে তোষামোদকারীদের দ্বারা সভা পূর্ণ ছিল। রাজা সভা থেকে উঠে ভোজন করে সিংহাসনের পরে বসে সবাইকে বলে – বেগুনের সব্জি অত্যুত্তম। এই শুনে তোষামোদকারীর দল বলে ওঠে – ধন্য মহারাজের বুদ্ধিকে। বেগুনের সব্জি চেখেই তার পরীক্ষা করে নিলেন। শুনুন মহারাজ। বেগুন ভাল তালে, পরমেশ্বর তার উপর মুকুট, চারি দিকে সমান, উপরের বর্ণ ঘনশ্যাম. ভিতরের বর্ণ মাঝখানে সমান বানিয়েছেন এমন শুনে গবর্গণ্ডি ও সভার লোকেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে হাসতে থাকে। তখন গবর্গণ্ডি নিজের মহলে শুতে গেল, দেউড়ী বন্ধ হলো। তোষামোদ কারীরা পাহারাদারকে বলল – যতক্ষণ সকালে আমরা না আসবো ততক্ষণ কারো সাথে মহারাজের দেখা করতে দেবে না। সে বলল – আজ তেমন কিছু বিশেষ পেলাম না।

তোষামোদী – আজ না হয় কাল হয়ে যাবে, তোমার - আমার ভাগাভাগি তো আছেই যা কিছু খাজানা প্রজাদের থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে আসে তাই নিজের, যখন রাজাকে নেশা ও বেশ্যাগিরি খেলায় সবাই মিলে লাগিয়ে দেয় তখন বিশেষ প্রাপ্তি জুটবে। সবাই বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, এটাই ঠিক।

তারা চলে গেল। যখন গবর্গণ্ডি শুতে গেল তখন গরম মসালা দিয়ে রান্না করা বেগুন পেটে গিয়ে গরম হলো এবং পায়খানা পেল। সারা রাত ধরে পায়খানায় যেতে হলো রাত্রিতে প্রায় ত্রিশ বার দাস্ত হলো। সারারাত ঘুম এলো না। বড়োই ব্যাকুল করে তুলল। সেই সময় বৈদ্য ডাকানো হলো। তিনিও গবর্গণ্ডি সদৃশ উল্টোপাল্টা ঔষুধ দিল। তাতে আরও খারাপ হলো। গবর্গণ্ডের কাছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কী করে থাকতে পারে ?

যখন সকাল হলো তখন তোষামোদকারীর দল সভার স্থান ঘিরে দাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে – মহারাজ কী করে ?

দাসী - সারারাত পায়খানা করে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

তোষামোদকারী – রাত্রিতে কেউ মহারাজের কাছে এসেছিল ?

দাসী – দশ বারো জন এসেছিল।

তোষামোদকারী – কে কে এসেছিল ? তাদের নাম জানো ?

দাসী – হ্যাঁ, তিন জনের নাম জানি বাকীদের জানি না।

তখন তোষামোদকারীরা ভাবতে থাকে কেউ তাদের নামে নিন্দা করে দেইনি তো ? এই জন্য আজ আমাদের মধ্যে থেকে দুইজন রাতেও দরজায় থাকা দরকার, সবাই বলল – খুব ভাল। এদিকে যখন আটটা বাজে তখন মুখমলিন গবর্গন্ড এসে গদীর উপর বসল। তোষামোদকারীরা একশ গুন মুখ বেজার করে শোকাকৃতি মুখ হয়ে উপরে উপরে মিছামিছি চেষ্টা দেখাবার ভান করে।

গবর্গন্ড – বেগুন খেতে ভাল কিন্তু বায়ু উৎপন্ন করে। সারা রাত দাস্ত হওয়ায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

তোষামোদী – বাঃ বাঃ মহারাজ ! এ সময় আপনার সদৃশ না কোনো রাজা হয়েছেন, হবে আর না কেউ। কেননা মহারাজ খাওয়ার সময় তার গুণের পরীক্ষা করলেন এবং রাত্রিতেই তার দোষও জেনে গেলেন। দেখুন মহারাজ ! বেগুন দুষ্ট, সেইজন্যই তো পরমেশ্বর তার উপর খুঁটি, চারি দিক কাঁটা লাগিয়ে দিয়েছে, উপরের বর্ণ কয়লার মতো এবং ভিতরের রং কুষ্ঠ রোগীর চামড়ার মতো করেছেন।

গর্বগন্ড – কী ব্যাপার, কালকেই তো তুমি এর প্রশংসা মুকুট ইত্যাদি অলঙ্কার দিয়েছো এবং এই সময় নিন্দায় খুঁটি ইত্যাদি উপমা দিচ্ছ ? এখন আমি কোন কথা সত্য বলে মানবো।

তোষামোদকারী ঘাবড়ে গিয়ে বলে – ধন্য, ধন্য ! ধন্য আপনার বিশাল বুদ্ধিকে ! কেননা কাল সন্ধ্যার কথা এখনও পর্যন্ত ভোলেননি। শুনুন মহারাজ। আমাদের বেগুন দিয়ে কী হবে ? আপনার প্রসন্নতায় আমাদের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতায় আপনি যদি রাতকে দিন এবং দিনকে রাত, সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলেন, আমাদের কাছে সবই ঠিক।

গবর্গন্ড – হ্যাঁ হ্যাঁ, চাকরদের এটা ধর্ম যে কখনও তারা স্বামীর কোনো কথার প্রত্যুত্তর দিবেনা কিন্তু আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ বলতে থাকে।

তোষামোদকারী – ঠিক। রাজারও এই ধর্ম যে, কোনো কথার চিন্তা

কখনও করবেনা। রাত দিন নিজের সুখে মগ্ন থাকুন। চাকর – বাকরের উপর সর্বদা বিশ্বাস করবেন। সব কাজ তাদের অধীনে রাখবেন। দোকানদারের মত হিসাব-পত্র দেখবেন না। যা কিছু সাদার কালো ও কালোর সাদা হয় সেটাই ঠিক রাখুন, যে গাছকে লাগাবেন তা কখনও কাটবেন না। যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে ত্যাগ করবেন না তাই সে যত বড়ো অপরাধই করুক না কেন কেননা যখন আপনি রাজা হয়েও কারো উপর লক্ষ্য রেখে আপনার আত্মা, মনও শরীর দ্বারা পরিশ্রম করলেন তাহলে জানতে হবে তার কপাল মন্দ এবং যখন হিসাবাদিতে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে সে মহাদরিদ্র, রাজা নয়। গবর্গন্ড – বলতো ? কেউ আমার মতো রাজা ও তোমাদের ন্যায় সভাসদ কখনও হয়েছেন না হবেন ? তোষামোদী – না-না, কখনও নয়, না হয়েছে, না হবে। গবর্গন্ড – ঠিক ঈশ্বর কি আমা অপেক্ষা উত্তম ? তোষামোদী কখনও হতে পারে না, কেননা তাকে কে দেখেছে ? আপনি তো সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। কেননা আপনার কৃপাকটাক্ষ বলে দরিদ্র ধনাঢ্য, অযোগ্য যোগ্য এবং অকৃপা থেকে ধনাঢ্য দরিদ্র, যোগ্য অযোগ্য তৎমুহূর্তে হয়ে যায়। এর মধ্যে পূর্ব হতে নিশ্চিত করা প্রাতঃকালকে সায়ংকাল মনে করে সকলে শুতে চলে গেল। সায়ংকাল যখন হলো তখন আবার সভা হলো। এর মধ্যে সিপাহীরা এসে সাধুদের ঝগড়ার কথা শোনাল। শুনে গবর্গন্ড সভাসহিত সেখানে গিয়ে সাধুদের জিজ্ঞাসা করে – তোমরা শূলে যাওয়াকে কেন সুখ মানছো ? সাধু – তোমরা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করো না, চড়তে দাও। সময় চলে যাচ্ছে, এইরকম সময় বড়ো ভাগ্যে পাওয়া যায়, গবর্গন্ড – এই সময় শূলে চড়লে কী ফল হবে ? সাধু – আমরা বলব না। যে চড়বে সে ফল দেখবে, আমাদের চড়তে দাও। গবর্গন্ড – না-না, যে ফল হয়, সেটা বলো। সিপাহী, এদেরকে ধরে নিয়ে এসো। ধরে নিয়ে আসা হলো। সাধু – আমাদেরকে চড়তে দিচ্ছেন না কেন ? ঝগড়া কেন করছেন ? গবর্গন্ড – যতক্ষণ তুমি এর ফল না বলবে, ততক্ষণ আমি চড়তে দেব না।

সাধু – অন্যকে বলার কথা নয় কিন্তু আপনি জিদ করছেন সেইজন্য

বলছি। যে কোনো মনুষ্য এই সময় শুলের উপর প্রাণত্যাগ করবে, সে চতুর্ভুজ হয়ে বিমানে বসে আনন্দস্বরূপ স্বর্গ লাভ করবে।

গবর্গন্ড – তাই নাকি। এরকম কথা হলে আমিই চড়ছি। তোমাকে চড়তে দেব কেন ?

এইরকম বলে অনতিবিলম্বে শূলের উপর চড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সাধু নিজের আসনে ফিরে এলেন। শিষ্যে বলল – মহারাজ, চলুন। এখানে এখন থাকা ঠিক হবে না। গুরু – এখন কোনো চিন্তার কারণ নেই। পাপের জড় গবর্গন্ড সে মারা গেছে। এখন ধর্মরাজ্য হবে। চিন্তার আর কী আছে ? এখানেই থাকো সেই সময় তার ছোট ভাই বড়ো বিদ্বান্ পিতা সদৃশ ধার্মিক এবং যারা তার পিতা সদৃশ ধার্মিক সভাসদ ও প্রজাদের মধ্যে সৎ পুরুষ যাদেরকে পিতা মারা যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হয়েছিল তারা সবাই এসে সুনীত নামক ছোট ভাইকে রাজ্যাধিকারী করে, সেই শবকে শূল থেকে নামিয়ে জ্বালিয়ে দিল এবং তোষামোদকারী দলকে কঠিন শাস্তি দিয়ে কয়েকজনকে বন্দী করা হলো এবং অনেককে নৌকায় করে সমুদ্র মাঝে নির্জন দ্বীপান্তর বন্দীখানায় আবদ্ধ করে উত্তম বিদ্বান্ ধার্মিকদের সম্মতি নিয়ে শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও সত্য ধর্মের বৃদ্ধি ইত্যাদি উত্তম কর্ম করে পুরুষার্থপূর্বক যথাযোগ্য রাজ্যের ব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকে এবং পুনরায় প্রকাশবতী নগরী নামে ব্যবস্থা চলতে থাকে এবং উচিত সময়ে সব কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে থাকে।

যখন যে দেশস্থ প্রাণীদের দুর্ভাগ্য উদয় হয় তখন গবর্গন্ড সদৃশ স্বার্থী অধর্মী প্রজাবিনাশক রাজা, ধনাঢ্য ও তোষামোদ-কারীদের সভা এবং তাদের সমান অধর্মী, উপদ্রবী, রাজবিদ্রোহীরা প্রজা হয় এবং যখন যে দেশস্থ প্রাণীদের সৌভাগ্য উদয় হওয়ার সময় হয় তখন সুনীত সমান ধার্মিক বিদ্বান পুত্রবৎ প্রজার পালক রাজসহিত সভা ও ধার্মিক পুরুষার্থী পিতা সমান রাজ ব্যবস্থায় প্রীতিযুক্ত মঙ্গলকারিনী প্রজা হয়ে থাকে। যেখানে দুর্ভাগ্যোদয়, সেখানে বিপরীত বুদ্ধি মনুষ্য পরস্পর দ্রোহাদি স্বরূপধর্ম থেকে বিপরীত দুঃখেরই কর্ম করতে থাকে এবং যখন যে দেশস্থ প্রাণীদের সৌভাগ্য উদয়

হওয়ার সময় হয় তখন সুনীত সমান ধার্মিক বিদ্বান পুত্রবৎ প্রজার পালক রাজসহিত সভা ও ধার্মিক পুরুষার্থী পিতা সমান রাজ ব্যবস্থায় প্রীতিযুক্ত মঙ্গলকারিনী প্রজা হয়ে থাকে। যেখানে দুর্ভাগ্যোদয়, সেখানে বিপরীত বুদ্ধি মনুষ্য পরস্পর দ্রোহাদি স্বরূপধর্ম থেকে বিপরীত দুঃখেরই কর্ম করতে থাকে এবং যেখানে সৌভাগ্যাদয় সেখানে পরস্পর উপকার, প্রীতি, বিদ্যা, সত্য, ধর্মাদি উত্তম কার্য অধর্ম থেকে আলাদা হয়ে করতে থাকে। তারা সদা আনন্দ লাভ করে।

যে মনুষ্য বিদ্যা কম জেনেও পূর্বোক্ত দুষ্ট ব্যবহার ত্যাগ করে ধার্মিক হয়ে পানাহার, বলা, শোনা, বসা, ওঠা, দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদি ব্যবহার সত্যযুক্ত ও যথাযোগ্য করে, সে কোথাও কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হয় না এবং যে সম্পূর্ণ বিদ্যা পড়ে পূর্বোক্ত উত্তম ব্যবহার ত্যাগ করে যে দুষ্ট কর্ম করে সে কখনও কোথাও সুখ প্রাপ্ত হতে পারে না। এইজন্য সব মনুষ্যের উচিত যে, আপনারা নিজ সন্তানদের, ইষ্ট-মিত্র, প্রতিবেশী, স্বামী ভৃত্যাদিকে বিদ্যা ও সুশিক্ষাযুক্ত করে সর্বদা আনন্দে থাকুন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী নির্মিতো
ব্যবহারভানুঃ সমাপ্তঃ।।

"ওঁম্"

উৎসর্গ

"ব্যবহার ভানু" পুস্তক হইল পুনঃ মুদ্রণ।
পিতু-মাতু স্মৃতি করিতে স্মরণ।।

ব্রতী হলাম, নির্মল মিশ্র বাগমারী মম ধাম।
পিতা পুলিন বিহারী মাতা পরমেশ্বরী নাম।।

পিতা মম লভেন জন্ম ১৩১৬ সন।
সাতাত্তর বছর বয়সেতে ছাড়েন জীবন।।

সালটি ছিল তেরশত তিরানব্বই।
পিতু দেবের স্বর্গারোহন জানল সবাই।।

তেরশত পঁচিশ সন মাতুদেবীর জন্ম ক্ষণ।
চৌদশত সাত সন মাতু দেবীর স্বর্গারোহন।।

দীনবন্ধু বেদ শাস্ত্রীর প্রবচন করিতে রক্ষণ।
পিতামহ যজ্ঞেশ্বর আর্য সমাজ করেন স্থাপন।।

আর্য ধর্ম প্রচার করিতে করিলাম ব্রত।
মম জৈষ্ঠ সহোদর নিরঞ্জন মিশ্রের মত।।

চাকুরি জীবন ছিল মম কন্যা গুরুকুলে।
অবসর নিলাম শেষে ভরিয়ে ফলে ফুলে।।

সর্বজনের শুভ কামনায় করিলাম আশ।
সেই হেতু "ব্যবহার ভানু" করিলাম প্রকাশ।।
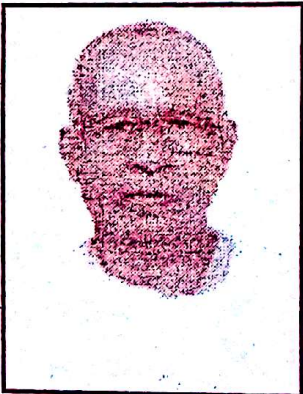
—ঃ নিবেদনে ঃ—

শ্রী নির্মল কুমার মিশ্র

গ্রামঃ-বাগমারী, পোঃ-নন্দকুমার
জেলা ঃ- পূর্ব মেদিনীপুর
সন্ ঃ- বাংলা ১৪১৯, ১লা বৈশাখ
ইংরাজী ২০১২, ১৪ই এপ্রিল